যাদব-জীবন

বীরভূম জেলা স্কুলের সহকারি-শিক্ষক

শ্রীমহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সন ১৩২৪ সাল।

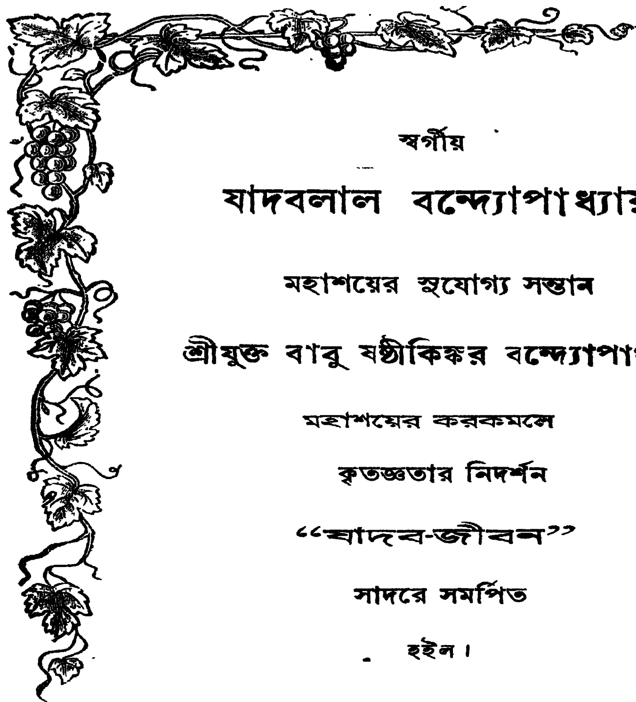
মূল্য এক টাকা মাত্র



প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস
২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা



৺যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়



স্বর্গীয়

যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের সুযোগ্য সন্তান

শ্রীযুক্ত বাবু ষষ্ঠীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

কৃতজ্ঞতার নিদর্শন

"যাদব-জীবন"

সাদরে সমর্পিত

হইল।



শ্রীষষ্ঠীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অবতরণিকা

স্বর্গীয় বাবু যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বনামধন্য মহাপুরুষ। তাঁহার কার্য্যাবলী অবলোকন করিলে মন বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হয় ও তাঁহার সমগ্র জীবনী জানিবার জন্য আমাদের মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

তাঁহার জীবনী জানিবার জন্য যে আগ্রহ জন্মে, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে—তিনি একদিন নিরন্ন, নিরক্ষর ও নিঃসহায় ছিলেন। অননুকূল অবস্থায় থাকিয়াও তিনি ন্যায়পথ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সাধুপথে থাকিয়াই লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া অনেকেই অপরিমেয় অর্থের অধিকারী হইয়াছেন, হইতেছেন এবং ভবিষ্যতেও হইবেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয় জন সেই সযত্নসঞ্চিত শোণিতসদৃশ অর্থ পরোপকারের জন্য মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া যশস্বী হইতেছেন?

যদি কোন নিরক্ষর অপরিমেয় অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সেই অর্থ নিঃস্বার্থে ব্যয় করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিব না কেন? তিনি আমাদের আরাধ্য দেবতা হইবেন না কেন? পাঠকগণ, ঐ প্রকার মহাত্মার জীবনী পাঠ করুন, সময় বৃথা অতিবাহিত হইবে না।

এই মহাপুরুষের চরিত্র বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, তাহা প্রমাদপরিশূন্য নহে। আবার এমন কতশত ঘটনা আছে, যাহাদের বিষয় আমরা কিছুই জানি না; সুতরাং সেই সকল ঘটনা ইহাতে লিখিত হয় নাই। অদূর-

দর্শী লেখকের সানুনয় অনুরোধ—আপনারা ভ্রমগুলি দেখাইয়া দিবেন এবং যে সকল ঘটনা লেখক অবগত নহে, সেই সমস্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবার ব্যবস্থা করিবেন। পরবর্ত্তী সংস্করণে তৎসমুদায় সন্নিবিষ্ট হইবে এবং আবশ্যকমত সংশোধিত হইবে। সংবাদদাতৃগণ অবশ্যই তজ্জন্য ধন্যবাদের পাত্র হইবেন এবং তাঁহাদের নাম এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট থাকিবে—তবে কেহ যদি নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত হন, সে স্বতন্ত্র কথা।

এই পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলি আমরা যাঁহার নিকট অবগত হইয়াছি ও যে স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহার ও সেই স্থানের উল্লেখ করিয়া আমরা অবতরণিকা সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করি।

বহুমানাস্পদ পূজ্যপ্রতিম কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক একখানি পত্র প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া এবং আরও কয়েকটী প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়া গ্রন্থকারকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। গ্রন্থকার তজ্জন্য তাঁহার নিকট অমোচ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিল। সিয়ারসোল রাজবাটী গুণগ্রাহী বলিয়া বিখ্যাত। পরমেশ্বর কুমার বাহাদুরকে দীর্ঘজীবী করুন।

রাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বক্তান নগর নিবাসী বাবু দক্ষিণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল কোল কোম্পনির নায়েব ছিলেন। ইনি যে সকল সংবাদ দিয়াছেন, তজ্জন্য ইনিও গ্রন্থকারকে যথেষ্ট ঋণী করিয়াছেন। ইঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত টাড়রা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র রায় বেঙ্গল কোল কোম্পানির একজন কর্ম্মচারী। ইনিও অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়াছেন।

রাণীগঞ্জের বাজারের একজন মহাজন বাবু নটবর পাল যাদব বাবুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। ইঁহার নিবাস বাঁকুড়া জেলায়। ইনি ব্যবসায় অবলম্বনে নিজের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ইনিও অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়াছেন।

মৌগ্রাম নিবাসী কাজি গোলাম সাহিদ সাহেবের নিকট ইঁহাদের বংশের যে ইতিহাস আছে, তাহা হইতে ঠাকুরবাড়ীর বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। হণ্টার সাহেবের রচিত বীরভূমের বৃত্তান্ত, কলিকাতা গেজেট এবং অন্যান্য কতিপয় বিবরণী হইতে যাবতীয় সাময়িক ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার তজ্জন্য সকলের নিকটেই ঋণী।

হেতমপুরের মহারাজার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামও এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকের মধ্যে যথাস্থানে তাঁহার নাম লিখিত আছে। লাভপুরের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের সপ্তম পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট যাদব বাবুর বংশ তালিকাটী সংগ্রহ করিয়াছেন ও লেখককে তাহা দিয়া সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এবং শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহোদয় এই পুস্তকের হস্তলিপি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পুস্তকের লিখিত ঘটনাগুলি অভ্রান্ত বলিয়াছেন। এই দুই মহাত্মার নিকট দীনহীন লেখক আজীবন অমোচ্য ঋণে ঋণী রহিল।

এতদ্ভিন্ন নানাস্থান হইতে নানা সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হওয়া অনুচিত।

পরিশেষে বক্তব্য, ব্যক্তিবিশেষের মনস্তুষ্টির জন্য অথবা কারণান্তরের বশবর্ত্তী হইয়া এই জীবনী লিখিত হয় নাই। দীনহীন লেখক প্রবেশিকা

পরীক্ষার সময় স্বর্গীয় বাবু যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। কৃতজ্ঞ হৃদয়ের অদম্য আগ্রহ তাহাকে এই জীবনী লিখিতে বাধ্য করিয়াছে। যাদব বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র কৃতী লেখক শ্রীযুক্ত বাবু নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে ও তাঁহাদের ব্যয়ে এই জীবনী সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম। সহৃদয় পাঠকগণ লেখকের কোনও অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। ইতি সন ১৩২৪ সাল, তারিখ ১৭ই আষাঢ়।

বাজিতপুর গ্রাম,
মকদম নগর পোষ্ট
বীরভূম জেলা



বিনীত
শ্রীমহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।



শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

যাদব-জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ

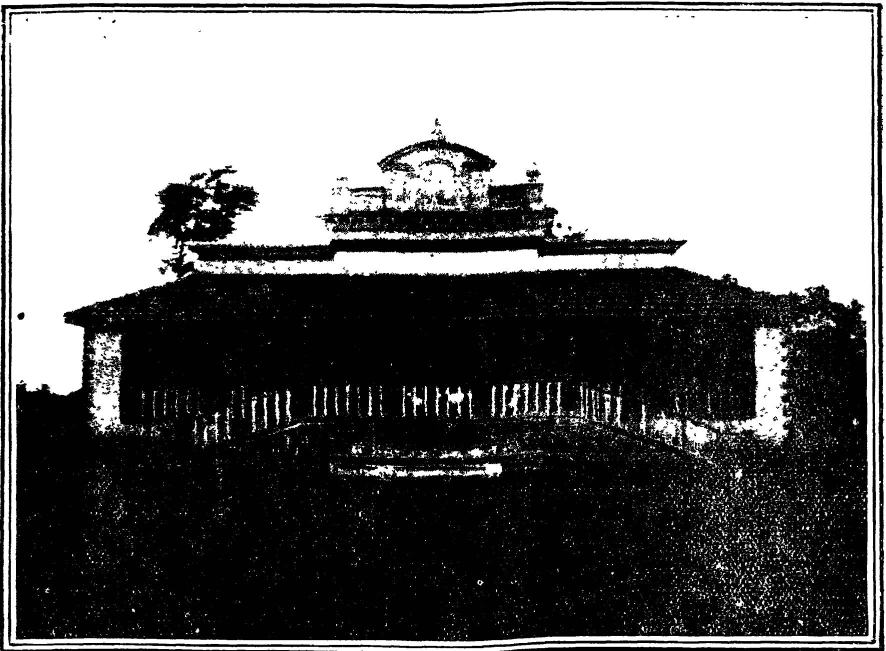
আদিকথা

বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাভপুর একখানি গণ্ডগ্রাম। আজকাল এখানে থানা আছে, ডাকঘর আছে, সাব্‌রেজিষ্টরী অফিসও আছে। একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, একটী বালিকা বিদ্যালয়, একটী চতুষ্পাঠী এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয়, এই গ্রামের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সম্প্রতি আমোদপুর-কাটোয়া রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে ও লাভপুরে একটী ষ্টেসনও হইয়াছে। যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহারা সহরের সুবিধা সহজে বুঝিতে পারেন না; আর যাঁহারা সহরে বাস করেন, তাঁহারা পল্লীবাসীর সুখের কথা, উপহাসের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন। আমরা বলি, যদি সহর ও পল্লীগ্রামের সুখসমৃদ্ধি উপলব্ধি করিতে কামনা করেন, তবে লাভপুরে বাস করুন— লাভপুর পল্লীগ্রাম হইলেও সহর।

এই গ্রামে নানাজাতি লোকের বাস। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর বসতি বিস্তর, হাড়ি মুচি বা ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকের সংখ্যাও কম নহে। এখানে মুসলমানের সংখ্যাও কম নহে ; কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, হিন্দু মুসলমানে বিবাদ নাই। বিগত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনায় লাভপুরের লোকসংখ্যা ৯৮০, মৌগ্রামের ১৯৬৭ এবং বাকুল ও লাঘাটার লোকসংখ্যা ৬৬৪। মোট লোকসংখ্যা ৩৬১১। ইহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১৮২২ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৭৮৯। মুসলমানদিগের মধ্যে পুরুষ ৫৭১ ও স্ত্রীলোক ৫৬২।

আমরা যে সময় হইতে লাভপুরের কথা বা কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিব, সেই সময়ের কোন ইতিহাসে লাভপুরের নাম বা কাহিনী লিখিত নাই। সুতরাং আমরা জনশ্রুতি ও পারিবারিক পঞ্জিকা অবলম্বন করিয়া এই অংশ লিখিতেছি, এবং সেই জন্য আমরা এই অংশের সন্তোষজনক কোন প্রমাণ বা পরিচয় দিতে অক্ষম।

লাভপুর একটী পীঠস্থান—ইহার পূর্ব্বনাম অট্টহাস। এখানে শক্তিপূজার প্রাধান্য দেখিয়া মনে হয়—যে যুগে শক্তি পূজার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়াছে, সে যুগে লাভপুর নিতান্ত নগণ্য স্থান ছিল না। তবে সে স্থানের নাম লাভপুর ছিল, অথবা অন্য-কোন নাম ছিল, তাহা সবিশেষ বলা যায় না।



গেষ্ট্ হাউস্

[৩ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

লাভপুরের দক্ষিণে একটী ক্ষীণকায়া নদী বিদ্যমান। আমরা এইরূপ শুনিতে পাই যে, এই নদীর অবস্থা পূর্ব্বে ভালই ছিল। তখন ভাগীরথী হইতে পণ্যবাহিনী নৌকা সকল এই নদী দিয়া যাতায়াত করিত। লাভপুরের নিকটবর্ত্তী শাঁকপুর বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল। এই শাঁকপুরের বিষয়ে জনৈক কবি একদিন গাহিয়াছিলেন—"শঙ্খের বাণিজ্য তথা নাম শঙ্খপুর।" কালের কুটিলতা হেতু নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইল এবং বিপুল বাণিজ্যেরও অধঃপতন ঘটিল। সম্ভবতঃ মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে নদীর এই অবস্থান্তর ঘটিয়াছে।

লাভপুরে বাণিজ্যের অবনতি ঘটিলে অধিবাসিগণ স্থানান্তরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—কিন্তু কোথায় যাইবেন তাহার স্থিরতা নাই। চারিদিকেই তখন বিদ্রোহ, চারিদিকেই তখন লুটপাট; 'জোর যার মুলুক তার'—এই নীতি তখন সর্ব্বত্র সমান প্রবল। তখন কে রাজা, কে প্রজা, তাহার নির্ণয় ছিল না। দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ তোগলক্ চীনদেশ আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার কামনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার বিপুলবাহিনী বেতনাভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এবং আহারের জন্য বঙ্গদেশে প্রজাবৃন্দের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া সমগ্র দেশকে অরাজক করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্গদেশ তখন দিল্লীশ্বরের অধীনতা

পরিত্যাগ করিলেও দিল্লীশ্বরের সৈন্যগণকে শাস্তি দিবার মত প্রবল হইতে পারে নাই। সুতরাং বঙ্গদেশ তখন অরাজক না হইয়াও অরাজক।

তৎকালে আরব, পারস্য প্রভৃতি প্রদেশের দরিদ্র অথচ কর্ম্মঠ যুবকগণ আপন আপন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আসিতেন ; এবং হয় সৈন্যদলে, নয় রাজদরবারে, কোনও একটী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ছলে বলে বা কৌশলে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রয়াস পাইতেন। চেষ্টা সকল বিফল হইলে যে কোন স্থলে বাড়ী করিয়া কাজী কিম্বা শাসনকর্ত্তার আসনে উপবেশন করিয়া, পরম সুখে কাল কাটাইতেন। রুমের জন্নুরীবংশজাত কোন বাদশাহের পুত্র শত্রু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ইঁহার নাম—ওসমান্। ইনি তোগলকের সৈন্যদলে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন। বঙ্গদেশের নানাস্থান সন্দর্শন করিয়া তিনি লাভপুরে বাস করিবেন স্থির করিলেন। লাভপুর তখনও লক্ষ্মীর কৃপায় 'লাভপুর' আছে। এই ওসমান্ সাহেব লাভপুরের রক্ষক, বিচারক বা শান্তিরক্ষক হইয়া লাভপুরের গৌরবরক্ষা করিয়াছিলেন।

বীরভূম জেলার প্রধান নগর—রাজনগর। মুসলমান শাসনকালে বা তৎপূর্ব্বে একটী পথ রাজনগর হইতে আমোদ-

পুরের মধ্য দিয়া লাভপুর পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই পথের একটী শাখা লাভপুর হইতে কাটোয়া ও অন্য এক শাখা কাঁদী দিয়া বহরমপুর পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। বীরভূম জেলায় গভীর নদী নাই, সুতরাং নৌকাযোগে এখানে বাণিজ্য অসম্ভব। পূর্ব্বে কাটোয়া হইতে লাভপুর পর্য্যন্ত নৌকা সকল বর্ষাকালে যাতায়াত করিত, কিন্তু নদীর অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত তাহাও রহিত হইয়াছে। এইজন্য কাটোয়া বা বহরমপুর হইতে মহাজনবর্গ পণ্যাদি লইয়া এই পথে যাতায়াত করিতেন। লাভপুর—কাটোয়া ও রাজনগরের এবং বহরমপুর ও রাজনগরের প্রায় মধ্যপথে বিদ্যমান। স্থলপথে দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার সময় লাভপুর একটী প্রধান গঞ্জে পরিণত হইয়াছিল।

কিন্তু এই অবস্থাও বেশী দিন থাকিল না। পাঠান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গেই লাভপুরেরও অবনতি ঘটিতে লাগিল। মোগল সম্রাট্ আকবর বঙ্গদেশের ভূমির মাপ ও সীমানা নির্দ্দিষ্ট করেন। সেই সময়ে লাভপুরের যে সীমা ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাতে আমাদের বোধ হয়, লাভপুর তখন সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল না।

বীরভূম জেলায় ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কয়েক বৎসরের জন্য বীরভূমের লোকে, আবার ক্লেশানুভব করিতে লাগিল। রাজনগরের অবস্থা মন্দ না হইলেও নানা

গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। লোকে ধন প্রাণ লইয়া নিরাপদে রজনী যাপন করিতে পারিত না। হয় দস্যু, নয় তস্কর নিরীহ প্রজাগণকে আক্রমণ করিয়া, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিত। কখন কখন প্রজাগণ জমিদারের ভয়েও ভীত থাকিত। সমগ্র বীরভূমী যখন এইরূপে প্রবলের প্রতাপে প্রকম্পিত থাকিত, লাভপুর তখনও শান্তির ক্রোড়ে থাকিয়া আর্ত্তের আশ্রয় স্থল ছিল। দস্যু বা তস্কর লাভপুরে উপদ্রব করিতে পারিত না। সুতরাং মহাজনবর্গ এখানে নিরাপদে ক্রয়-বিক্রয়াদি করিতে পারিতেন। লাভপুরের অবস্থা এইজন্য যে আবার অচিরে উন্নত হইয়াছিল—তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইংরাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে দস্যু ও তস্করের উপদ্রব কমিয়া গেল। সুরাজ ইংরাজ বাহাদুরের সুশাসনে তস্করের ভয় একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং এইজন্য বণিক্‌গণ আপন আপন সুবিধা মত নানাস্থানে ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমোদপুর ও পুরন্দরপুর প্রভৃতি স্থান, ঐই সময় হইতে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিল।

নানাস্থানে বাণিজ্যের কারবার হওয়াতে লাভপুরের অবনতি ঘটিল। ধনজনপূর্ণ নগর আবার জনহীন প্রান্তরে পরিণত হইবে বলিয়া অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইবার সঙ্কল্প

করিলেন, কিন্তু সহসা লাভপুর পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। জমিদারী প্রথার প্রবর্ত্তনে লাভপুর একজন সুদক্ষ জমিদারের অধীন হইল। ইঁহার সুবিবেচনার ফলে লাভপুরের শান্তি বিনষ্ট হয় নাই—লাভপুরে দস্যু বা তস্করের উপদ্রব প্রবেশ করে নাই এবং কেহ কোনও প্রকার ক্লেশানুভব করে নাই।

লাভপুর যখন বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল, তখন নানা স্থানের লোকে আপন আপন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য লাভপুরে আসিত। কেহ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয়ে সমর্থ হইতেন, কেহ বা ভৃত্যের কর্ম্ম করিয়া অক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। যে সকল বণিক্ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লাভপুর নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, আজিও তাঁহাদের বংশধরগণ লাভপুরে বসতি করিয়া আপন আপন বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। চন্দ্র, দত্ত, দে প্রভৃতি উপাধিধারী গন্ধবণিক্গণ এখনও লাভপুরের অধিবাসী।

বাণিজ্যের অবনতি ঘটিলেও লোকে আপন আপন অবস্থা উন্নত করিবার জন্য লাভপুরে আসিতে লাগিল। বাণিজ্য বা ব্যবসার দ্বারা উন্নতির সম্ভাবনা না থাকিলেও উন্নতি লাভের আরও একটী উপায় ছিল। সেই উপায়—সেবায় জমিদার-বর্গকে সন্তুষ্ট করা। জমিদারবর্গের কার্য্যপরিচালন জন্য ব্রাহ্মণ

কায়স্থ প্রভৃতি মসীজীবীর প্রয়োজন। এইজন্য লোকে জমিদারবর্গকে সেবায় সন্তুষ্ট করিয়া অর্থোপায়ের পথ সুগম করিবার জন্য লাভপুরে আসিত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সকল মহাত্মা ভাগ্য পরীক্ষার জন্য লাভপুরে আসিয়াছিলেন, গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তন্মধ্যে একজন। গণেশচন্দ্রের পিতা দুর্গাদাস মধ্যে মধ্যে লাভপুরে তাঁহার কোনও আত্মীয়ের বাটীতে আসিতেন। গণেশচন্দ্র পিতার সঙ্গে আসিয়া লাভপুরে মধ্যে মধ্যে দুই একদিন থাকিতেন। এইরূপে অবস্থান করিবার সময় গণেশচন্দ্র জমিদারবর্গের দুই একজনের স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পুরন্দরপুরের নিকটবর্ত্তী সুলতানপুর গণেশচন্দ্রের জন্মভূমি। এখানে তাঁহার সামান্য জমিজমাও ছিল—বাটীতে দুর্গোৎসবাদি পূজাপার্ব্বণও যথারীতি সম্পাদিত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পিতৃহীন হইয়া গণেশচন্দ্র দারিদ্র্যের তাড়নায় কাতর হইয়া পড়িলেন। সামান্য জমিজমা যাহা ছিল, দারিদ্র্যের পরামর্শে তাহা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া জীবিকার জন্য তিনি লাভপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গণেশচন্দ্র বুদ্ধিমান্, বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ। তাঁহার হৃদয়ে

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল, তিনি রীতিমত স্নানাহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। পূর্ব্বেই তিনি জমিদারবর্গের পরিচিত হইয়াছিলেন—সুতরাং এ অবস্থায় জমিদারবর্গ তাঁহার মত লোককে কর্ম্ম দিয়া প্রতিপালন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

লাভপুরের অনতিদূরে ভালাশ নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামটী লাভপুরের সরকার-উপাধিধারী ব্রাহ্মণ জমিদারের অধান। গণেশচন্দ্র মাসিক ১৲ এক টাকা বেতনে এই গ্রামের তহশীলদার অর্থাৎ গোমস্তা হইলেন। ভিক্ষা বা পার্ব্বণী বলিয়া প্রজাগণ তহশীলদারকে খাজনা দিবার সময় কিছু কিছু করিয়া দিয়া থাকে। ভালাশে ইহা হইতে যে আয় হইত, তাহার পরিমাণ বার্ষিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা। সুতরাং গণেশচন্দ্রের মাসিক আয় বেতন সমেত ৩৷৽ সাড়ে তিন টাকা মাত্র। গণেশ-চন্দ্র যে ভালাশের গোমস্তা ছিলেন, তাঁহার পৌত্রগণ এক্ষণে সেই ভালাসের জমিদার হইয়াছেন।

গণেশচন্দ্র এই সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া যেরূপ স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইতেন, আজ কাল যাঁহার মাসিক আয় ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা, তিনিও সে ভাবে সংসার চালাইতে অসমর্থ। অসমর্থতার কারণ—চাউল তখন টাকায় একমণ দশ সের। মুগ মসূর ঘৃত প্রভৃতি যথেষ্ট সুলভ। বাটীর স্ত্রীলোকেরাও এখন-

কার মত নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতেন না। তাঁহারা স্বহস্তে সূতা কাটিতেন। কোন্ কোন রমণী সূতা দিয়া কাপড়ের উপর ফুল তুলিতেন। গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া অনেকেই দৈনিক দুই আনা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতেন।

তৎকালীন স্ত্রীলোকেরা আধুনিক অবলাগণের মত বিলাস-বিভ্রমে দিন কাটাইতেন না। সংসারের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া বৃথা গল্প বা পরনিন্দায় মূল্যবান্ সময়ের সংহার করিতেন না। সূতা কাটিয়া বা কাপড়ে ফুল তুলিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেন। ফুল তোলা কাপড়ের নাম গুলবাহার—এই কাপড় তখন অনেকেই যত্নের সহিত ব্যবহার করিতেন এবং এখনও অনেকে এই কাপড় পরিয়া থাকেন। তৎকালীন স্ত্রীলোক-দিগের আরও একটী মহদ্ গুণ ছিল—তাঁহারা অলঙ্কারের জন্য আপন আপন স্বামীকে শশব্যস্ত করিয়া তুলিতেন না। আজকাল যে ভদ্র লোকের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, তাঁহার গৃহে দুই একখানি ব্যতীত যে সকল অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই স্বর্ণময়। পূর্ব্বে গৃহিণীগণ লক্ষপতির পত্নী না হইলে স্বর্ণালঙ্কারের সাধ করিতেন না—আর আজকাল যাঁহার ভাণ্ডারের ভাণ্ডগুলি শূন্যোদর, যাঁহার হস্তপদ ঋণজালে জড়িত, তাঁহারও পত্নীর শরীরে অন্ততঃ আধসের সোণার অলঙ্কার! পাঠিকাগণ, লোকের বিচার দেখুন, কেহ তাঁহাদের ঋণ মোচন করিয়া দিবে না, অথচ নিন্দা

করিবে—ইহা কি অন্যায় নহে ? কালের স্রোত কি ভয়ঙ্কর ! কালের গতি কি বিচিত্র !

তৎকালে লোকে মাতার বা পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে অকাতরে অন্নবিতরণে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। যাঁহার অবস্থা নিতান্ত হীন, তিনিও ক্রিয়া উপলক্ষ্যে যথাসাধ্য দুই এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গুরু, পুরোহিত, নাপিত, জমিদার ও গোমস্তার যথাযোগ্য সম্ভাষণে ক্রটি করিতেন না। যথারীতি আপ্যায়নের পর তাঁহাদিগকে সদক্ষিণা ভোজ্য প্রদান করিতে হইত। এক একটী ভোজ্যে অন্ততঃ একমণ চাউল ও তদুপযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রদত্ত হইত। দাতার অবস্থা ভাল হইলে ভোজ্যে চাউলের পরিমাণ কখন কখন দুই মণেরও অধিক হইত। আজকাল আর সে দিন নাই। এখন কদাচিৎ দুই একটী ক্রিয়া উপলক্ষ্যে এইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

লাভপুরে চাউলাদি সুলভ ছিল, তাহার অন্য একটী কারণ আছে। লাভপুরের পূর্ব্বদিকে তিন ক্রোশের অনধিক পথ অতিক্রম করিলে বর্ত্তমান মুরশিদাবাদ জেলার সীমানা পাওয়া যায়। মুরশিদাবাদ জেলার এই অংশটী বরোঁয়া থানার অধীন এবং এই অংশে ধান্য কলাই, মসূর ও গম প্রভৃতি বৎসর বৎসর প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বীরভূম জেলা

গঠিত হয়, তদবধি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই অংশটী বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। কিন্তু লাভপুর ও তাহার দক্ষিণাংশ মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল। এই অংশটী কোন্ সময়ে বীরভূমের অন্তর্গত হঁয়, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। বরোঁয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামের শস্যাদি (বিক্রয়ের জন্য) লাভপুর দিয়া আমোদপুরে আসিত এবং তথা হইতে নানাস্থানে প্রেরিত হইত।

আজকাল লাভপুরে শস্যাদি সুলভ নহে। চারিদিকে রেলপথ হইয়াছে বলিয়া শস্যাদি (বিক্রয়ের জন্য) এখন আর লাভপুর দিয়া আমোদপুরে আসে না। লাভপুরে বা তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামে ধান্য যথেষ্ট জন্মে, কিন্তু কলাই বা গম যথেষ্ট জন্মে না। লাভপুরে আবার রেলওয়ে ষ্টেসন হইয়াছে; সুতরাং আশা করা যায়, আবার এখানে শস্যাদি সুলভ হইতে পারে, আবার এখানে বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটিয়া পূর্ব্ব শ্রী ফিরিয়া আসিতে পারে।

গণেশচন্দ্রের আয় সামান্য হইলেও, অবস্থা নিতান্ত হীন হইলেও তাঁহার পরিবারবর্গ ভরণ-পোষণের ক্লেশানুভব করেন নাই। গণেশচন্দ্রের চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ও কর্ত্তব্যপ্রিয়তা অতুলনীয়। তিনি সাধারণের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। বিবাদবিসংবাদ উপস্থিত হইলে উভয়

পক্ষই তাঁহার শরণাগত হইত। তিনিও অপক্ষপাত বিচার করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি পুরুষ, কি নারী, সকলেই তাঁহাকে গুরুজন মনে করিয়া দেবতার মত ভক্তি করিত। এই মহাত্মার ঔরসে তদীয় ধর্ম্মপত্নী আহ্লাদিনী দেবীর গর্ভে যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ১২৪৮ সালের ১৩ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাল্যকাল

যাদবলাল জনকজননীর যত্নে শুক্লপক্ষীয় শশি-কলার ন্যায় দিন দিন পরিপুষ্ট হইতে লাগিলেন। প্রথমে মা, পরে বাবা ও তারপর দুই একটী শব্দ শিখিয়া যাদব হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে সোজা হইবার চেষ্টা করিয়া হাঁটিবার অভ্যাসে মনোযোগ দিলেন।

যতদিন শিশু হাঁটিতে না শিখে, আমাদের বোধ হয়, ততদিনই শিশুর সুখের কাল। হাঁটিতে আরম্ভ করিলেই সংসারের গোলযোগে প্রবেশ করিতে হয়। শিশু যখন অস্ফুটস্বরে দুই একটী কথা বলে, কিংবা ধীরে ধীরে দুই এক পা করিয়া চলিতে চায়, তখন তাহার মাতাপিতা ও আত্মীয় স্বজনেরা "বাহবা" "সাবাস" প্রভৃতি প্রশংসাসূচক শব্দের সহিত করতালি দিয়া, বালকের উৎসাহ পরিবর্দ্ধনের জন্য যথেষ্ট আয়োজন করে। শিশু সে সময়ে মনে করে, অনায়াসে চলিতে বা বলিতে

পারিলেই দিগ্বিজয়ী বীর হওয়া যায় ; তাই সেও তখন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া সত্বরেই চলিতে বা বলিতে শিখে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় ! কি পরিতাপ ! বালক যতই চলিতে ও বলিতে শিখে, তাহার প্রশংসার পরিমাণও ততই কমিতে থাকে। লোকে তখন আর তাহার পাদক্ষেপ আগ্রহ সহকারে দেখে না ; তাহার আধ আধ-বাণী শুনিয়া আদর করা দূরের কথা, তোত্‌লা বলিয়া উপহাস করিবার চেষ্টা করে। তবে কি সংসারে শিক্ষানবিশেরই আদর অধিক ?

এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকেরা মনে করে, প্রশংসা লাভ করিতে হইলে আরও একটা কিছু শিখিতে হইবে—কেবল চলিতে বা বলিতে পারিলেই চিরকাল প্রশংসা পাওয়া যাইবে না। বালকেরা এইরূপে এই সময় হইতে চিন্তাশীলতার সহিত আলাপ করে, এবং এইরূপে মানবের মনোবৃত্তি সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। বালকেরা ভাবে, কোন্ পথে গমন করিলে, অথবা কোন্ কাজ করিলে, কিংবা কাহার মত হইলে, লোকে আমায় ভাল বলিবে ? এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটী ভাব বালকের মনে অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করে ; ভাবটী এই—কিরূপে মনের আনন্দে থাকা যায় ? বালকের ভাবগুলি ভাল, যদি সংসর্গদোষে দুষ্ট না হয়। এই সময়ে বালকেরা যে আদর্শের অনুকরণ করিবে, সেই আদর্শ

যদি প্রকৃত আদর্শ না হয়, তাহা হইলে ভাবগুলি সুপথে চালিত না হইয়া কুপথে যায় ও অনিষ্টোৎপত্তির পথ সুগম করে। যে কোন বালককে প্রকৃত মানুষে পরিণত করিতে হইলে এই সময় হইতেই পিতা মাতার যথেষ্ট যত্ন করা আবশ্যক। পিতা মাতা সত্যবাদী, ধার্ম্মিক ও দয়ালু হইলে বালকেরাও অজ্ঞাতসারে ঐ সকল গুণের অধিকারী হইবে। অজ্ঞাত, কুলশীলা ধাত্রীর উপর শিশুর ভার সমর্পণ করিয়া, অপরিণামদর্শী ভৃত্যের উপর ভ্রমণ করাইবার ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই সুফল পাওয়া যায় না।

যাদবলালের শৈশবকাল অতীত হইল। তিনি পৌগণ্ডে পদার্পণ করিলেন; গণেশচন্দ্রও যাদবের সুশিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আজ কাল যেমন গ্রামে গ্রামে পাঠশালা বা বিদ্যালয় আছে, তখন এমন ছিল না। আজ কাল শিক্ষার পথ যেরূপ সুগম হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না; এমন কি, ইহার শতাংশের একাংশও ছিল না। তৎকালে দুই একজন বিশিষ্ট বিশিষ্ট অধ্যাপক টোল করিতেন, কিন্তু সেখানে কেবল সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ ও দর্শনাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। যে সকল বালক ভবিষ্যতে গুরু বা পুরোহিত হইবে, যে সকল বালকের অভিভাবকগণ গুরু বা পুরোহিত, তাহারাই বাধ্য হইয়া টোলে পড়িত। সুতরাং সে শিক্ষায় সাধারণের কোন

উপকার ছিল না। তৎকালে কদাচিৎ কোন কোন গ্রামে দুই একটী পাঠশালা পরিদৃষ্ট হইত। সেখানে পত্রাদি লিখন পঠন, জমাখরচের সুবিধার জন্য সামান্য সামান্য অঙ্কের সমাধান ও দুই একটী চাণক্য শ্লোক শিখান হইত। যে এইগুলি সুন্দররূপে আবৃত্তি করিয়া অর্থ করিতে পারিত, সে "কৃতবিদ্য" বলিয়া বিবেচিত হইত। ইংরাজী ভাষা পারসী ভাষার স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া, তখন ইংরাজী শিখিবার চেষ্টা সবে চলিতেছে মাত্র।

বীরভূম জেলায় শিক্ষার ব্যবস্থা তখন ভাল ছিল না। বীরভূম জেলাস্কুল ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইলেও দরিদ্র বালকের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা কষ্টকর ছিল। সে সময়ে কোন গ্রামে একজন ইংরাজী জানা লোক উপস্থিত হইলে লোকে তাহাকে আগ্রহের সহিত দেখিতে আসিত।

গণেশচন্দ্র যাদবলালের সুশিক্ষার জন্য চিন্তিত ছিলেন। নানাপ্রকারে সদুপদেশ দিয়া সৎসঙ্গে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু সে সকল যত্ন বৃথা হইল। চঞ্চল বালকের কর্ণে সদুপদেশ সহজে প্রবেশ করিতে পারিল না; আর যাদবের সহচরবর্গও চাণক্যের তুল্য পণ্ডিত কিংবা যুধিষ্ঠিরের তুল্য ধার্ম্মিক ছিলেন না; তবে তাঁহাদের একটী মহদ্‌গুণ ছিল, তাঁহারা গুরুজনের নিকট চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেন না। নদীগর্ভস্থ তৃণের মত

তাঁহারা উপদেশরূপ স্রোতের মুখে চলিয়া পড়িতেন; কিন্তু স্রোতের অভাব ঘটিলেই সগর্ব্বে শীর্ষোত্তোলন করিতে ভুলিতেন না। যাদবলাল জমিদারনন্দন সহ সানন্দে কাল কাটাইতেন। সহচরবর্গের সকলেই যাদবের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন না। ধনীর সন্তান উমেশচন্দ্র তাঁহার পরমবন্ধু ছিলেন। উমেশচন্দ্র লাভপুরের বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় বাবু হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খুল্লতাত। আর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু—জনৈক ধনাঢ্য বণিকের সন্তান শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ চন্দ্র।

জমিদারতনয়ের সহচর হইব—এই কামনা কি তখন, কি এখন, অপরিণামদর্শী বালকেরা সযত্নে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে। এই সঙ্গে মিশিয়া যে কতশত দরিদ্র বালক ভবিষ্যতের সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, আপন আপন জীবন বিপন্ন করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা নির্ণয়সীমার বহির্ভূত। এই সঙ্গে মিশিয়া আবার দুই একজন যথোচিত উন্নতিলাভও করিয়াছেন, তবে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

তৎকালে জমিদারনন্দন কিরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেন, এখানে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। জমিদারগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দেয় রাজস্ব দিতে পারিলেই তাঁহাদের জমিদারী অক্ষুণ্ণ থাকিবে। জমিদারীর রাজস্ব কখন কমিবে না বা বাড়িবে না। এইরূপ

জমিদারী প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে জমিদারগণ ক্রমেই প্রবল হইতে থাকেন। জমিদারীমধ্যে তাঁহাদের ক্ষমতা অসীম। গ্রামের চৌকীদার জমিদারদত্ত ভূমি ভোগ করিত, সুতরাং জমিদারের অধীন। প্রজার অভাব বা অভিযোগ জমিদারকে জানাইতে হইত, জমিদার গোমস্তা ও পাইকের সাহায্যে যথাজ্ঞান সুবিচার করিতেন। আদেশ প্রতিপালনের জন্য কোন কোন জমিদারের বিশ পঁচিশ বা ততোহধিক পাইক বা লাঠিয়াল থাকিত। সময়ে সময়ে আবশ্যকমত পাইক সংগ্রহের চেষ্টাও চলিত। সুবিচারের জন্য সহৃদয় ইংরাজ-রাজ স্থানে স্থানে থানা ও আদালতের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে অন্নহীন প্রজা প্রবল প্রতাপ জমিদারের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইতে পারিত না। যদি কখন কোন প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে নালিশ করিত, তাহা হইলে তাহার দুর্দ্দশার একশেষ ঘটিত। জমিদারের লোকে সেই প্রজাকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিত। সুতরাং জমিদারের ভয়ে প্রজাগণ সতত শঙ্কিত থাকিত।

জমিদারনন্দন বাল্যকালে দাসদাসীর হস্তে প্রতিপালিত। কৈশোরে ও যৌবনে চাটুকারগণ তাঁহাকে পাইয়া বসিত। সুতরাং সুশিক্ষার অভাবে জমিদারতনয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়িতেন। তবে কোন কোন স্থলে এইরূপ শিক্ষালাভ করিয়াও আদর্শ—

জমিদার দেখিতে পাওয়া যাইত। তখন সাধারণ লোকের ধারণা ছিল—উপপত্নী রাখা, মদ্যপান করা, প্রজাশাসনের নামে দাঙ্গা হাঙ্গামা করা, পূজাপার্ব্বণের সময়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া সমারোহ দেখান প্রভৃতি জমিদারের গুণ। লোকে বলিত—যে জমিদারের নামে প্রজার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয় না, যে জমিদারের নামে বাঘে বলদে একঘাটে জল খায় না, সে কি জমিদার!

জমিদারের সম্বন্ধে দেশের লোকের ধারণা যখন এইরূপ, তখন জমিদারতনয়ের সুশিক্ষা অসম্ভব নয় কি? সুখের বিষয় এই যে, লাভপুরের জমিদারগণ এই প্রকার উচ্চশ্রেণীর জমিদার ছিলেন না, তাঁহাদের হৃদয়ে দয়া মায়া ছিল, তাঁহারা তনয়গণের সুশিক্ষার জন্য সদুপদেশ দিতেন এবং সুযোগ পাইলে সেই সুযোগের অপব্যবহার করিতেন না। লাভপুরের জনৈক জমিদার রামদয়ালবাবু আপনার পুত্র কালীবাবুকে বহু অর্থব্যয় করিয়া একজন ইংরাজ শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং তিনি সেই শিক্ষার ফলে একজন উপযুক্ত লোক হইয়া সাধারণের নিকট সুশিক্ষার উপকারিতা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার অমায়িক ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া ও তাঁহার মুখে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা ইংরাজী ভাষায় শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিতাম।

গণেশচন্দ্র সুবিবেচক ও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি যাদবলালকে জমিদারনন্দনগণের সহিত মিশিতে নিষেধ করিতেন; কিন্তু তখন তাঁহার কথা শুনে কে? যাদবলাল তখন অপরিণামদর্শী বালক। বালক কি কখন আপাতরম্য সুখের খেলায় মত্ত না হইয়া থাকিতে পারে? গণেশচন্দ্র বাধা দিতে আরম্ভ করিলেন, যাদবলাল সুকৌশলে সেই সকল বাধা অতিক্রম করিতে শিখিলেন—সুতরাং সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইল না।

এই সময়ে কাদের হোসেন ঠাকুরবাড়ীতে একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়া পারসী পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পারসী ভাষা তখন আর আদালতের ভাষা নয়। পারসী পড়িলে—রাজসরকারে, নবাব দরবারে কি জমিদারের বাড়ীতে আর চাকুরী পাওয়া যায় না—তবে পুরাতন দলিল দুই একখানা পড়িবার জন্য পারসী জানা আবশ্যক। মুসলমানের পক্ষে পারসী ভাষাশিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক পারসী ভাষায় লিখিত, নমাজ প্রভৃতি নিত্যক্রিয়া পারসীভাষায় পঠিত হয়। সুতরাং কাদের হোসেনের পাঠশালায় পারসী শিখান হইলেও ছাত্রের অভাব ঘটে নাই। কাদের হোসেন দূরদর্শী সুশিক্ষক ছিলেন। তিনি অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিয়া ছাত্রগণকে বাঙ্গালাভাষায় জমাখরচের হিসাব

ও পত্রাদি লিখন শিখাইতেন। গণেশচন্দ্র যাদবলালকে এই বিত্তালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

যে বাড়ীতে হিন্দুগণ কোন দেবদেবীর পূজা করেন, লোকে সেই বাড়ীকেই ঠাকুরবাড়ী বলে। হিন্দুরা ঠাকুরবাড়ীতে মুসলমানগণকে প্রবেশ করিতে দেন না। সুতরাং কাদের হোসেন ঠাকুরবাড়ীতে পাঠশালা সংস্থাপন করিলেন—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? তৎকালে লাভপুরে হিন্দু ও মুসলমানগণ কিরূপ সদ্‌ভাবে বাস করিতেন তাহা ঠাকুর-বাড়ীর বিবরণ হইতে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঠাকুরবাড়ীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা একান্ত আবশ্যক।

প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, ওসমান সাহেব লাভপুরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লাভপুর গ্রাম রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ঘোড়াঘাট হোসেনপুরের বিখ্যাত বংশে বিবাহ করেন। এই বংশে জাত মহম্মদ ফাজেল সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ওসমান খাঁ কররাণীর পৌত্রীকে বিবাহ করিয়া বঙ্গদেশে সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহম্মদ ফাজেল লাভপুরে গড় নির্ম্মাণ করেন ও লাভপুর যাহাতে সুরক্ষিত থাকে, তাহার রীতিমত ব্যবস্থা করেন। এই গড়ের চিহ্ন এখনও বিত্তমান।



বস্নদেব (ভূগর্ভে প্রাপ্ত) [২৩ পৃঃ

মহম্মদ ফাজেল হিন্দু ও মুসলমানদিগকে সমানভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার আদেশে মুসলমানগণ হিন্দুগণের অপ্রীতিকর কোন কর্ম্ম করিতে পারিত না। তিনি জীবনের মধ্যাহ্ণকালে সংসারের সুখভোগ, পত্নীর প্রণয় ও পুত্রের স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া ফকিরের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং অচিরে সিদ্ধিলাভ করিয়া নানাবিধ অলৌকিক কাণ্ড দেখাইয়াছিলেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই তাঁহাকে যথাযোগ্য ভক্তি প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইত না। লোকে তাঁহাকে "ঠাকুর" বলিয়া সম্বোধন করিত। তদবধি মহম্মদ ফাজেলের বাড়ী "ঠাকুরবাড়ী" বলিয়া পরিচিত। আজিও ঠাকুরবাড়ী বলিলে লাভপুরের অন্তর্গত মৌগ্রামের মুসলমান বাড়ীকে বুঝায়।

ওসমান খাঁ কররাণীর সময় হইতে ইঁহারা জমিদারপদ-বাচ্য ও কাজির পদে নিযুক্ত হন। এই বংশের পুত্র বা কন্যাগণ হইতে উৎপন্ন হইয়া অনেকেই এখনও বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোট, ঘোড়াঘাট হোসেনপুর, বীরভূম জেলার অন্তর্গত সিয়ান্, সেকেড্ডা, কুষ্টিকুরী, মৌড়েশ্বর, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাঁচতোপী এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সুঁটরো নামক স্থানে বাস করিতেছেন। মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময়ে এই বংশের প্রতিপত্তি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ইঁহারা মোগল-সম্রাটের নিকট হইতে নান্দকার পরগণা নিষ্করে ভোগ করিবার

অধিকার লাভ করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে কাজির বিচার উঠিয়া যায়, এবং তাঁহারই শাসনকালে বঙ্গীয় ১১৯৩ সালে নান্দকার পরগণার কর ১০৲ দশটাকা নির্দ্ধারিত হয় এবং ৩৮৬/০ বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রদত্ত হয়। এই ৩৮৬/০ জমির মধ্যে ২০০/০ আজিও মহম্মদ ফাজেলের বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। এই বংশের ইতিহাস লিখিত হইলে আমাদের বোধ হয়, সাধারণের অপ্রীতিকর হইবে না।

যাদবলাল এই ঠাকুরবাড়ীর পাঠশালায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পাঠে মনোযোগ দিতে পারেন নাই। সহপাঠী কালাচাঁদ যাদবলালের ছোট এবং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, সুতরাং তিনি ইচ্ছাসত্ত্বেও যাদবলালকে সুপরামর্শ দিয়া পাঠে মনোযোগী করিতে পারেন নাই। পিতার ভয়ে যাদবলাল বিত্থালয়ে যাইতেন, কিন্তু তাহা যাদবের নিকট ক্রমেই কষ্টকর হইতে লাগিল। বিত্থালয়ে যাদবলাল সুশীল ও সুবোধ ছাত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই।

যাদবলাল এই সময়ে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন, সুতরাং পাঠারম্ভের কয়েক মাস পরেই পাঠ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। যাদবলালের লেখাপড়া এই হেতু এই খানেই শেষ হইয়াছিল—বুঝিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সৌভাগ্যের সূত্রপাত

যাদবলাল ক্রমে ক্রমে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। দেহরাজ্যের সিংহাসনে যৌবনরাজ আসীন হইয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে ব্যস্ত হইলেন, সুতরাং শরীরের ভিতরে ও বাহিরে নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। গণেশচন্দ্র ভাবিলেন—যাদবলাল মূর্খ ও দুর্দ্দান্ত—বিশেষতঃ সে এখন যুবা। এইজন্য তিনি স্থির করিলেন—পুত্রের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিতে হইবে। পুত্র পিতার নিকট এইপ্রকার অযাচিত ও অভাবিত ব্যবহার লাভ করিয়া আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন।

বাল্যকালের যাদব এখন নূতন মূর্ত্তি লাভ করিয়াছেন; পূর্ব্বে যাদব পিতার ভয়ে জড়বৎ থাকিতেন, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে পিতার সম্মুখে আসিতেন না; কিন্তু এখন তাঁহার আর সে ভাব নাই। এখনকার যাদব নির্ভীক, হিতাহিতবিবর্জ্জিত। সঙ্গদোষে পড়িয়া যাদব তামাক খাইতে শিখিয়া-

ছেন, সিদ্ধি চরস বা গাঁজা দেখিয়া অপ্রস্তুত হন না। সঙ্গ-দোষে পড়িয়া দরিদ্র বালক যাদবচন্দ্র সুধা মনে করিয়া বিষ ভক্ষণ করিতে শিখিয়াছেন।

মানব যখন সর্ব্বপ্রথমে কুকর্ম্ম করিতে অগ্রসর হয়, তখন তাহার মনে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। মনের একাংশ বলে—এটা কুকাজ, কুকাজ করিও না পরিণাম বিষময় হইবে। অপরাংশ বলে—জগতে কুকাজ বা সুকাজ বলিয়া কোন কর্ম্মই নাই, যাহা তোমার নিকট সুকাজ, তাহাই আবার অপরের নিকট কুকাজ ; সুকাজের বা কুকাজেব মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। এইরূপে মানবমন স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা-প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিতে থাকে এবং পরিশেষে স্থির করে—একবার বা দুইবার কোন কাজ করিলে, পরিণামে যদি মন্দ ফল ভোগ করা যায়, তাহা হইলে সেই কাজ করিতে সাধারণতঃ কাহারও প্রবৃত্তি থাকে না ; এবং আবশ্যক মত সংশোধন করাও চলিতে পারে। এইরূপ চিন্তার পর লোকে, বিশেষতঃ বালকেরা, দুই একবার কোন অন্যায় কাজ করিয়া থাকে। প্রকৃতির নিয়ম, কোন কাজ দুই একবার করিলে সেই কাজ করিবার ইচ্ছা প্রবল হয় ও ক্রমে ক্রমে তাহা অভ্যাসে পরিণত হয়। অভ্যাস আর প্রকৃতি প্রায়ই এক। বালকেরা প্রথম প্রথম আমোদ মনে করিয়া দুই একবার তামাক খাইয়া

থাকে। পরে ইহা যখন অভ্যাসগত হইয়া যায়, তখন আর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। অন্যান্য মাদকদ্রব্য সম্বন্ধেও লোকের ব্যবহার তামাকের তুল্য।

যাদবলাল মনে করিয়াছিলেন, গোপনে গোপনে তামাক খাই, পূজা বা পার্ব্বণে দুই একদিন অপর কোন মাদক দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করি, সুতরাং এ সকল দোষের নহে; গুরু-জনেরা এ সকল জানিতেও পারেন না, তবে তাঁহারা যদি কখন জানিতে পারেন—আমি এ সকল তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিব। মানুষ যাহা ভাবে, তাহা যদি সত্যসত্যই কার্য্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে জগতে কোন অভাব থাকিত না; তাহা হইলে শিষ্টের সুযশ ও দুষ্টের নিন্দা জগতে ঘোষিত হইত না। কোন কাজ দুই একদিন করিলে তাহা যে অভ্যাসগত হয়, এবং মানুষ যে অভ্যাসের দাস, তাহা লোকে জানিয়াও জানে না, বুঝিয়াও বুঝে না। জগতে কোন কাজ গোপনে থাকে না, সময়ে সমস্তই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যাদবলালের ব্যবহার গণেশচন্দ্রের কর্ণগত হইল। তিনি ভাবিলেন—পুত্রের বিবাহ দিলে সুমতি ঘটিতে পারে। সুতরাং তিনি যাদবলালের বিবাহের জন্য মনোযোগী হইলেন।

যাদবলাল কুলীন সন্তান। গুণহীন হইলে কি হয়? দরিদ্রতা কুলীনতা বাড়াইয়া দেয়, কমাইতে পারে না। অন্ন-

হীন গৃহহীন কুলীননন্দন স্বেচ্ছাবিহারী। সে আজ এক শ্বশুরবাড়ী, কাল আর এক শ্বশুরবাড়ী, পরশ্ব অন্য এক শ্বশুর-বাড়ীতে বাস করিয়া জীবনকাল কাটাইয়া দেয়। কুলীনের যে সন্তান যত অধিক বিবাহ করে, তাহার সম্মান ততই অধিক হয়। পত্নীর প্রতিপালন—কুলীননন্দনের বিশ্বাস, কুলীনের কর্ত্তব্য নয়। বল্লালসেন, এখন তুমি কোথায় আছ? তোমার স্থাপিত ধর্ম্মের পরিণাম একবার দেখিয়া যাও। তুমি মনে করিয়াছিলে, কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপিত করিয়া সেই পুণ্য-বলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবে? তখন কেন ভাব নাই যে, পতিভক্তিপরায়ণা কুলীনকন্যার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করিয়া অশ্রু-ধারা নির্গত হইবে, আর সেই অশ্রুর প্রবাহে তোমার পুণ্যবল ভাসিয়া যাইবে। তখন কেন ভাব নাই যে, তোমার পুণ্যসলিলা মন্দাকিনীতে তপ্তাশ্রুর প্রবাহ পড়িবে।

বল্লালসেনের কল্যাণে যাদবলালের বিবাহ অচিরে সম্পা-দিত হইল। তিনি মঙ্গলডিহি গ্রামের মুখোপাধ্যায়-বংশজাতা কুঞ্জবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। কুঞ্জবালা কুলীন-কন্যা। তিনি বাল্যকাল হইতেই দারিদ্র্যের কঠোর তাড়না সহ্য করিতেছেন। এইজন্য তিনি যাদবলালের হস্তে পতিত হইয়া অধিকতর দুঃখিতা হইবার কারণ দেখিতে পান নাই। নীরস মরুভূমিতে যদি কখন সুকোমল পুষ্পের সম্ভব সম্ভব হয়,

আর সেই পুষ্প স্ফুটনোন্মুখ হইলে, যদি মরুভূমির প্রতপ্ত বায়ু বহিতে থাকে—তাহা হইলে বলুন দেখি পাঠক, কোমল-পল্লব-কুসুমের অবস্থা কিরূপ হয়? যে নদীর বিমল সলিলে অমৃতের ক্ষীরধারা সতত বিদ্যমান, সেই নদীর স্রোত প্রতপ্ত বালুকাময় প্রদেশে পতিত হইলে তাহার পরিণাম কিরূপ হয়? কুঞ্জবালার আচার ব্যবহার গণেশচন্দ্রের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেও যাদবলালের স্বভাব ফিরাইতে পারে নাই। কোমল কুসুমে বিরচিত মালার বন্ধনে প্রমত্ত বারণ বাঁধা থাকে না। গণেশচন্দ্র যাদবের পরিণাম চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

সকল কার্য্যের একটা সীমা আছে। নদীর স্রোত প্রবল হইয়া উভয়কূল প্লাবিত করে, কিন্তু সেই স্রোত কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া যায় না। সাগরসলিলে জোয়ার-তরঙ্গ নানা রঙ্গে খেলা করে সত্য, কিন্তু সেই তরঙ্গেরও উচ্চতা এবং স্থায়িতা সম্বন্ধে একটা সীমা আছে—তরঙ্গ সেই সীমা কখন উল্লঙ্ঘন করে না। বেত্র সহজেই নুইয়া যায়, রবর সহজেই বর্দ্ধিতায়তন প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহাদেরও একটী সীমা আছে। সেই সীমার বাহিরে লইয়া যাও, রবর ছিঁড়িয়া যাইবে, বেত্রদণ্ড বিদীর্ণ হইবে। গণেশচন্দ্রের ধীরতারও সেইরূপ একটা সীমা ছিল। তাঁহার হৃদয় কোমলকুসুমে গঠিত হইলেও কর্ত্তব্যসাধনে প্রস্তরবৎ কঠিন হইত। সেই হৃদয় এখন কয়েক

দিন ধরিয়া যাদবের অবাধ্যতায় পীড়িত হইতেছে। যাদবলাল তাঁহার একমাত্র পুত্র। এবার বুঝি পুত্রস্নেহ তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না! গণেশচন্দ্র যখন যাদবের জন্য চিন্তিত—গণেশের হৃদয়ে যখন ভীষণ অনল প্রধূমিত—যাদব তখন একটী ঘটনার বাতাস দিয়া সেই অনল জ্বালাইয়া দিলেন। ঘটনাটী এই—কয়েক জন প্রতিবেশী যাদবলালকে কাঁধে করিয়া বাটীতে পৌঁছাইয়া দিলেন—যাদবলাল সেদিন অতিরিক্ত গঞ্জিকা সেবন্ করিয়া প্রথমে অজ্ঞান ও পরে মরণাপন্ন দশায় উপস্থিত হইয়াছেন। গণেশচন্দ্র মনের আগুন মনে চাপিয়া রাখিয়া যাদবলালকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মস্তকে শীতল জল ঢালিবার ব্যবস্থা হইল; তেঁতুলের সরবৎ খাওয়ান হইল, ও পাখার বাতাস চলিতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টার পর যাদব চৈতন্য লাভ করিলেন ও পর দিনে পিতার তিরস্কারে সত্যসত্যই চৈতন্য লাভ করিয়াছিলেন। গণেশচন্দ্রের তীব্র তিরস্কারে যাদবলাল কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অশ্রু তুমি কে? লোকে যে যা' বলে বলুক, আমরা বলি—অশ্রু তুমি মন্দাকিনীর পবিত্র সলিল, তুমি পাষাণতুল্য কঠোর হৃদয়কে কুসুমের কোমলতা প্রদান কর; তুমিই অনু-তাপতপ্ত পাপীর অন্তরের অনল নিবাইবার জন্য স্বর্গের শান্তি-



শ্রীশ্রীফুল্লরা দেবী

[৩০ পৃঃ

সলিল সেচন কর। অশ্রু তুমিও ধন্য! যে অশ্রুপাত করিতে জানে, সেও ধন্য! যিনি যাদব লালের ভাবী জীবন দেখিয়া বিস্মিত হইতে চান, তিনি এখন একবার যাদবের অশ্রুপ্রবাহ অবলোকন করুন!

যাদবলাল পিতার কঠোর তিরস্কার শুনিয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি ভাবিলেন—পিতা যথার্থই বলিয়াছেন—"এক পয়সা রোজগার করিবার ক্ষমতা নাই, অথচ খরচ করিতে মজবুৎ।" পিতার কথার মর্ম্ম অবগত হইয়া নিজের পরিণাম চিন্তা করিলেন ও শিহরিয়া উঠিলেন; অবশেষে স্থির করিলেন "তামাক ব্যতীত অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিব না। যদি অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারি, তবে এ মুখ আর পিতাকে দেখাইব না।" দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যাদব কাহাকেও কিছু না বলিয়া, পিতার তহবিল হইতে সামান্যমাত্র পাথেয় লইয়া, মনে মনে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া, নবাগতযৌবনা প্রিয়তমা পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া, ভগিনীর অকৃত্রিম স্নেহ বিস্মৃত হইয়া, পিতার তিরস্কার মনে রাখিয়া, কুলদেবী ফুল্লরা মাতাকে প্রণাম করিয়া প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই গৃহত্যাগ করিলেন। দরজার পাশে দেওয়ালে তিনি লিখিয়াছিলেন—যাদব চলিল, ৫০০৲ পাঁচশত টাকা সংগৃহীত না হইলে সে আর ঘরে ফিরিবে না।" যাদবের যাইবার সময় আমরা যদি তখন সেখানে উপস্থিত

থাকিতাম, তাহা হইলে বলিতাম—যাও, যাদব যাও, তোমার পবিত্র হৃদয় তোমার প্রতিজ্ঞা পালনের সহায় হউক! আর এই সামান্য ঘটনা তোমার অসামান্য জীবনের শিক্ষক হউক! এই ঘটনায় তোমার অসামান্য সৌভাগ্যের সূত্রপাত হউক!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাগ্যোদয়

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। রাণীগঞ্জ ও তাহার নিকটস্থ গ্রামসমূহে প্রচুর পরিমাণে পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লার জন্য রাণীগঞ্জের অভ্যুদয়।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানি সর্ব্বপ্রথমে হাওড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণ করেন। শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য এখানে দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইয়াছিল। অল্প কয়েক বৎসর হইল, আদালত রাণীগঞ্জ হইতে আসানসোলে গিয়াছে। রাণীগঞ্জের জলবায়ু মন্দ নয়। এইজন্য রাণীগঞ্জ অচিরে বাণিজ্যের প্রধান স্থানে পরিণত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল কোল কোম্পানি এখানে খনি হইতে কয়লা উঠাইয়া ধনাগমের পথ সুগম করিলেন। সুবিখ্যাত বার্ণ কোম্পানি মাটির বাসনের নূতনতর কারখানা খুলিয়া দিলেন। আবার কাগজ প্রস্তুতের কলও একটী স্থাপিত হইল, সুতরাং এখানে লোক সংখ্যা ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতে

লাগিল, এবং লোকের সুবিধার জন্য ডাক্তার খানা, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, হাট বাজার প্রভৃতি সত্বর প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে ম্যালেরিয়ার একান্ত অভাব বলিয়া রাণীগঞ্জ অচিরে ধনজনপূর্ণ নগরে পরিণত হইয়াছিল।

নানাদেশের লোক সদুপায়ে অর্থোপায়ের জন্য দলে দলে রাণীগঞ্জে আসিত ও আপন আপন সুবিধা মত কর্ম্ম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের পথ সুগম করিত। যাদবলাল রাণীপাথরে আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া, রাণীগঞ্জের সুখ্যাতির কথা শুনিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন —বাণীগঞ্জে উপস্থিত হইলে একটা না একটা কাজ পাওয়া যাইবেই। আমবা বলি, কাজের অভাব কোথাও নাই, অভাব কেবল লোকের। লোকে অভাবে পড়িয়া যে কোন কর্ম্ম গ্রহণ করে, কিন্তু সন্তোষের অভাবে সে কর্ম্মে সুখী হয় না। জগতে সন্তোষের আধিপত্য স্থাপিত না হইলে অভাবের অভাব ঘটিবে না।

যাদবলাল গৃহত্যাগের সময় পিতার তিরস্কারের কথা স্মরণ করিলেন। পিতা বলিয়াছেন—"এক পয়সা রোজগার করিতে পার না, কিন্তু খরচ করিতে বেশ মজবুৎ।" তিনি স্থির করিলেন—অর্থ আবশ্যক, কিন্তু যাই কোথায়? অবশেষে রাণীগঞ্জের সুখ্যাতির কথা মনে পড়িল, ও তৎক্ষণাৎ রাণীগঞ্জের দিকে রওনা হইলেন।



স্কুল বোর্ডিং (যাদবলাল ইংরাজি বিদ্যালয়ের)   [৩৪ পৃঃ

রাণীগঞ্জে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—হাট বাজার লোক জন ইত্যাদি এখানে সব নূতন, সব অপরিচিত। কে তাঁহাকে কর্ম্ম দিয়া প্রতিপালন করিবে? নিকটে পয়সা থাকিলে এখানে নির্ব্বিঘ্নে থাকা যায়, রাণীগঞ্জে কোন বস্তুর অভাব নাই। কিন্তু যিনি পয়সার জন্য এখানে আসিয়াছেন, তাঁহার স্থান কোথায়? যাদবলাল বাটীতে থাকিয়া মনশ্চক্ষে রাণীগঞ্জের যে চিত্র দেখিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া দেখেন—তাহা প্রকৃত নহে। তিনি দুই এক স্থানে চাকরীর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা তাঁহার নৈরাশ্য বাড়াইয়া দিল। সে চেষ্টা তাঁহার মনের আঁধারে অমানিশার অন্ধকার মিশাইয়া দিল। যাদবলাল অনন্যোপায় হইয়া কয়েক দিনের জন্য একটী হোটেলে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

সংসার সাধন-ক্ষেত্র। এখানে যে যে কর্ম্ম সাধনে মনোনিবেশ করে, সে সেই কর্ম্মেই সিদ্ধিলাভ করে। পুলিস-প্রহরী-রক্ষিত সহরে সার্গল-দ্বার গৃহমধ্যে তস্করও প্রবেশ লাভ করিতে পারে—ইহার কারণ তাহার একাগ্র চেষ্টা। নিরন্ন পথিক বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে—তাহারও কারণ অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে তাহার একাগ্র চেষ্টা। ছাত্রগণ যতদিন পাঠে একাগ্রতা রক্ষা করিতে পারে, ততদিন সে পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়াও অকৃতকার্য্য হয় না। দুরারোহ-পিচ্ছিল-পথাবলম্বনে ধর্ম্ম-গিরির উচ্চতম চূড়ায় উঠিবার

আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ কর, নানা-মার্গাবলম্বী মনকে একাগ্রতা শিখাও, মনে রাখিও সংসারে কাহারও আশা অসম্পূর্ণ থাকে না।

যাদবলাল হোটেলে স্নানাহার করিয়া সারাদিন কর্ম্মের সন্ধান করেন, রজনীর প্রথমাংশের কার্য্যও তাঁহার সেইপ্রকার ছিল। এইরূপে কয়েক দিন অতীত হইলে যাদবলাল বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির তৎকালীন নায়েব বাঘনাপাড়া নিবাসী বাবু বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃপায় মাসিক সাত টাকা বেতনে বেঙ্গল কোল কোম্পানির অধীনে কুলির হিসাব-রক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। রাণীগঞ্জের বাজারে বাসা করিয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করিলে সাত টাকায় দিন চলিতে পারে, কিন্তু সে ভাবে থাকিলে কিছু জমে না। যাদবলালের উদ্দেশ্য অর্থ সংগ্রহ করা। অর্থের জন্য যাদব গৃহত্যাগ করিয়াছেন, গৃহত্যাগের পর কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহা জানাইবার জন্য বাটীতে একখানি পত্রও লিখিতেন না। সেই যাদব কি উদর-পূরণোপযোগী অর্থ পাইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কালাতিপাত করিতে পারেন? বেহারীবাবু যাদবলালের পরিশ্রমশীলতা, কার্য্যে তৎপরতা ও সত্যে নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে গৃহের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিলেন। যাদবলালের গ্রাসাচ্ছাদন তখন নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল, মাসে মাসে তাঁহার সাতটী করিয়া টাকাও জমিতে লাগিল।

কয়লার খাদ, আমাদের বিশ্বাস, অনেকেই দেখেন নাই। কেহ কেহ দূর হইতে অথবা রেলওয়ে ট্রেণ হইতে খাদের মুখ দেখিয়াছেন মাত্র, কিন্তু সেই দেখায় খাদের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান জন্মে না। কয়লার খাদ দেখিবার বস্তু।

কোথায় কত নীচে কয়লা আছে, তাহা পরীক্ষার জন্য একটী লৌহশলাকার সাহায্য লইতে হয়। এই লৌহশলাকার অগ্রভাগ অতীব সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ, এবং প্রস্তর বিদারণে সমর্থ। এই শলাকা প্রোথিত করিয়া কয়লার সন্ধান লইতে হয়। এইরূপ প্রণালীর ইংরাজী নাম বোরিং (Boring) ; কয়লা উঠাইবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে কূপের মত একটী গর্ত্ত বা খাদ প্রস্তুত করিতে হয়। এই গর্ত্তের বা মুখের ইংরাজী নাম পিট্ (Pit)। পিট্ প্রস্তুত হইলে কুলিরা গর্ত্তে নামিয়া কয়লা কাটিতে আরম্ভ করে। কয়লা কাটিবার সময় মধ্যে মধ্যে স্তম্ভ রাখিতে হয়, নতুবা উপরের চাপে মাটি বসিয়া যাইতে পারে। এইরূপে কয়লা কাটিয়া যাওয়ার নাম গ্যালারী। কয়লার খাদ অন্ধকারময়, সেখানে সূর্য্যের কিরণ যায় না, বায়ুর গমনাগমন নাই। আলোকের জন্য ও বায়ুর গমনাগমনের জন্য যথেষ্ট কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। এইরূপ এক একটী খাদে কুলীরা নিয়ত কাজ করিয়া থাকে। এক একটী খাদে কুলীর সংখ্যা তিন শত হইতে দেড় হাজার পর্য্যন্ত বা তাহারও

অধিক। কুলিরা কয়লা কাটিতে কাটিতে খাদের মুখ অর্থাৎ পিট্ হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। কোন কোন খাদের কয়লা নিঃশেষিত হইলে সেই খাদের নীচে আবার বোরিং করা হয়। এইরূপে কোন কোন খাদে দুই তিন বার বোরিং করিয়াও কয়লা পাওয়া যায়।

যাদবলালের কাজ—খাদে নামিবার সময় কে কে নামিল ও তাহাদের কে কত বেতন পাইবে এবং কে কি পরিমাণ কার্য্য করিয়াছে ইত্যাদির হিসাব রাখা। বিহারী বাবুর গৃহকর্ম্মের মধ্যে হাটবাজারের ব্যবস্থা করা, বালক বালিকাগণ যথাসময়ে খাইয়া বিদ্যালয়ে যাইতেছে কি না ইত্যাদি তত্ত্বাবধান করা। যাদবলাল কর্ত্তব্য কর্ম্মে অমনোযোগী ছিলেন না কিম্বা অবহেলা করিতেন না। তাঁহার শরীরে যেরূপ সামর্থ্য ছিল, মনের বলও তদনুরূপ ছিল। তাঁহার হৃদয়ে দয়ামায়ার অভাব ছিল না, তিনি কাহারও অপ্রীতিকর কোন কর্ম্ম করিতেন না। যে যাদব বাল্যকালে অসৎসঙ্গের সঙ্গী হইয়া অবনতির পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন, যে যাদবের বাল্যাবস্থা দেখিয়া আত্মীয়গণ যাদবের পরিণাম চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ হইতেন—আজ তাঁহারা দেখুন—যাদব মনুষ্যপদবাচ্য হইতেছেন। প্রভাতের তপন কুয়াসার অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া আপন প্রভাব প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাদবলাল আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া

কিয়ৎক্ষণ অবকাশ লাভ করিতেন, সেই অবকাশকাল অযথা আমোদে অথবা আলস্যের ক্রোড়ে অতিবাহিত না করিয়া সহৃদয়তার পরিচায়ক কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেন।

যে সকল কুলি খাদে কাজ করে, তাহাদের জীবন প্রীতিপ্রদ নহে। তাহারা খাদে কাজ করিয়া যে বেতন পায়, তাহাতেই ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করে। পত্নীসহ পুত্রকন্যা লইয়া কুলিকে কাজ করিতে হয়। সকলে মিলিয়া কাজ না করিলে তাহাদের দিন চলে না। সকলে মিলিয়া খাটিয়াও তাহারা যে বেতন পায়, তাহা ভরণ পোষণেই চলিয়া যায়—সঞ্চয় কিছুই হয় না। কুলিরা সপরিবারে খাটিয়াও ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারে না। আমাদের বোধ হয়, তাহারা ভবিষ্যতের জন্য ভাবিতে জানে না। যদি কখন কোন কুলি কিছু জমায়, তবে সে তাহা কোন এক ছুটীর দিনে বন্ধুবান্ধব লইয়া মদ খাইয়া খরচ করিয়া ফেলে। কুলিদের মধ্যে কেহ লেখাপড়া জানে না বা শিখিবার জন্য যত্ন করে না, এবং শিখাইবার কোন ব্যবস্থাও নাই। তাহারা জানে পরিশ্রম করিতে, আর সেই অর্থ লইয়া অতিকষ্টে দিন কাটাইতে। সঞ্চয় কাহাকে বলে—তাহা তাহারা জানে না। কোন কুলি পীড়িত হইলে অথবা তাহার পত্নী, পুত্র বা কন্যা প্রসব করিলে, কিম্বা পুত্র বা কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইলে, কুলির দুঃখের সীমা থাকে না। সে তখন অর্থের জন্য

লালায়িত হইয়া অধিক সুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হয়। যে কুলি একবার টাকা ধার করে, সে আর ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। তাহার ঋণ শোধ হইয়াও হয় না। সুদের টাকাই শোধ করিতে পারে না—সুতরাং ঋণ ক্রমেই বাড়িয়া যায়। সহস্র সহস্র কুলির জীবনযাত্রা এইরূপে নির্ব্বাহিত হয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে মানবের এই দুরবস্থা দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়। সকলেরই কর্ত্তব্য—ইহাদের অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করা।

যাদবলাল কুলির হিসাব-রক্ষক ছিলেন বলিয়া কুলির দুর্দ্দশার কারণ উত্তমরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি অবসর-কালে পীড়িত কুলির সেবা করিতেন, জাতি বিচার না করিয়া আর্ত্তের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। রোগীর ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন, কখন কখন এই ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে কিছু কিছু খরচ করিতেও হইত—কিন্তু তিনি তাহাতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আবশ্যক মত কুলিদিগকে বিনা সুদে টাকা ধার দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে সদুপদেশ দিয়া তাহাদের জীবনে জ্ঞানের আলোক জ্বালাইবার চেষ্টা করিতেন। এই চেষ্টার ফলে কুলিরা যাদব বাবুকে দেবতার মত ভক্তি করিত—এবং আবশ্যক হইলে তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে অপ্রস্তুত হইত না।

যাদব বাবুর যশের সীমা ছিল না। কুলিরা জানিত—

যাদব বাবু দয়ার সাগর। কুলিরা বলিত—জগদীশ্বর! যাদব বাবুর উন্নতি হইতেছে না কেন? বেঙ্গল কোল কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ যাদব বাবুর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। গুণ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাদব বাবুর গুণের কথা বেঙ্গল কোল কোম্পানির ম্যানেজার সাহেবের কর্ণগত হইল, তিনি গুণের সম্মান করিলেন—যাদব বাবুর বেতন বাড়াইয়া দিলেন। কুলির সর্দ্দারগণ বেতন বাড়িয়াছে শুনিয়া হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন। যাদবলালও গুণের পুরস্কার আছে বুঝিতে পারিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ত্তব্য সাধনে মনোযোগী হইলেন। যাদবলাল সঞ্চিত অর্থ গণনা করিয়া দেখিলেন—"এখনও পাঁচশত হয় নাই।" পদোন্নতি-জনিত আনন্দ তাঁহাকে গৃহের কথা স্মরণ করাইয়াছিল, কিন্তু গৃহে গমনের জন্য ব্যস্ত করিতে পারিল না—কারণ তখনও পাঁচশত টাকা সঞ্চিত হয় নাই। যাদবলাল পিতার চরণ স্মরণ করিয়া, জননীর স্নেহরাশি মনে করিয়া গৃহে গমনের জন্য চঞ্চল হইলেন। কিন্তু সেই চঞ্চলতা তাঁহার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের কারণ হয় নাই। তাহা তাঁহাকে কয়েক দিনের জন্য বিষণ্ণ করিয়াছিল,—তাহা তাঁহার হাসিমুখে কয়েক দিনের জন্য বিষাদ-কালিমার আবরণ দিয়াছিল।

কয়েক জন কুলির সর্দ্দার যাদবের এই ভাবান্তর অবলোকন

করিয়া তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। যাদবের মনের ভাব মনেই ছিল, তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। যিনি জগতের যাবতীয় জীবের আশা পূর্ণ করেন, তিনিও যাদবের জন্য চিন্তিত হইলেন। সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর তখন যাদবের অর্থবর্দ্ধনের জন্য এক নূতন পন্থার সৃষ্টি করিলেন।

বেঙ্গল কোল কোম্পানির প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের বাসের জন্য ও কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি গৃহ আবশ্যক। গৃহের আবশ্যকতা এত অধিক, যে কয়েক দিন অপেক্ষা করা চলে না। আর সে সময়ে কুলির একান্ত অভাব। অতিরিক্ত পয়সা দিয়াও কুলি পাওয়া যায় না। বেঙ্গল কোল কোম্পানির নায়েব ম্যানেজার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ সমবেত হইয়া স্থির করিলেন—একজন কণ্ট্রাক্টরের উপর গৃহ প্রস্তুতের ভার প্রদত্ত হউক। কিন্তু তখন কুলির দুর্ভিক্ষ উপস্থিত অর্থাৎ কুলি বা মজুর পাওয়া যায় না। সুতরাং গৃহ প্রস্তুত করিবে কে? খাদের কাজ বন্ধ করিয়া কুলিদিগকে গৃহ প্রস্তুত করান চলে না। তাহা করিলে কোম্পানির ক্ষতি অধিক হইবে।

একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী যাদব বাবুকে বলিলেন—"আপনি ইচ্ছা করিলে এই সময়ে কুলি সংগ্রহ করিতে পারেন; আমরা জানি, কুলিরা আপনার একান্ত অনুগত ও বশীভূত,

এইজন্য বলিতেছি, আপনি গোপনে কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করুন ও ঘরগুলি প্রস্তুত করিয়া দিন। যাদব বাবুর ধারণা ও বিশ্বাস, প্রভুর কার্য্য ব্যতীত অন্য কাজ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা ভাল নয়; এবং ভৃত্যের কর্ম্ম করিতে হইলে গোপনে অন্য ব্যবসা করাও ভাল নয়। এই জন্য তিনি কণ্ট্রাক্টরের কর্ম্ম করিতে রাজী হইলেন না। এদিকে ঘর না হইলেও চলে না। ঘরের অভাবে কর্ম্মচারিগণের সবিশেষ কষ্ট হইতেছে। কোন কোন কর্ম্মচারীর ধারণা—যাদব বাবু অনায়াসে গৃহগুলি প্রস্তুতের ভার লইতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া লইতেছেন না; সুতরাং তাঁহারা যাদব বাবুর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহারা যাদব বাবুকে বুঝাইয়া ছিলেন—এই কার্য্যে কিঞ্চিৎ লাভের আশাও আছে, আর কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্ষতি হইলেও কেহ কিছু বলিবেন না; কারণ এখন ঘরের একান্ত আবশ্যক। যাদব বাবু প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—গোপনে কণ্ট্রাক্টরী করিলেও ইহা গোপনে থাকিবে না এবং আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিবার অভ্যাস জন্মিতে পারে; সুতরাং পরিণামে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। সামান্য অর্থের জন্য আমি অন্যায় কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না। ধন্য যাদব! ধন্য তোমার ন্যায়নিষ্ঠতা। আমরা সামান্য তুই পয়সার প্রত্যাশায় প্রভুর কর্ম্মে অবহেলা দেখাইতে লজ্জা বা সঙ্কোচ মানিয়া চলি না, আর তুমি কেবল ন্যায়ের

মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য প্রভুর আবশ্যকতা জানিয়াও, নিজের স্বার্থ সত্ত্বেও কার্য্য করিতেছ না। ধন্য তোমার বিবেক, আর ধন্য তোমার নিস্পৃহতা!

কর্ম্মচারিগণ যাদব বাবুর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কর্ম্মচারী বেঙ্গল কোল কোম্পানির ম্যানেজার সাহেবের নিকট যাদব বাবুর উত্তর ও তাঁহাদের অনুরোধ প্রভৃতি সমস্তই আমূল বলিলেন। বলিবার সময় তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ম্যানেজার সাহেব যাদব বাবুর উপর রুষ্ট হইবেন, এবং সম্ভবতঃ এইজন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিতেও পারেন। আমরা বুঝিতে পারিলাম না—যাদব বাবুর পদচ্যুতির সহিত তাঁহাদের আনন্দের সম্বন্ধ কেন? যাদবের ব্যবহারে বা কার্য্যে কেহই অসন্তুষ্ট ছিলেন না; তবে তাঁহাদের এ ভাব কেন? আমাদের বোধ হয়, যাদবের ন্যায়নিষ্ঠার ও কর্ত্তব্যপ্রিয়তার পরীক্ষা-কাল উপস্থিত। তুই একজন যদি অপরপক্ষ অবলম্বন না করিবে, তবে পরীক্ষা চলিবে কেন? অগ্নির উত্তাপ না হইলে স্বর্ণের পরীক্ষা হয় না। নীরস কঠোর প্রস্তরে ঘৃষ্ট না হইলে স্বর্ণের সুচারু শোভা জানা যায় না।

ম্যানেজার সাহেব যাদব বাবুর উত্তর শুনিয়া প্রীত হইলেন। তিনি গুণবান্, গুণের আদরের জন্য নিজনামে না রাখিয়া অন্য কোন নামে রাখিয়া কণ্ট্রাক্টরের কর্ম্ম করিবার জন্য তাঁহাকে

প্রকাশ্য ভাবে আদেশ দিলেন, এবং বলিলেন—কোম্পানির কার্য্যের ক্ষতি না করিয়া কাজ চালাইবে। যাদব বাবুও তখন আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। যাদব বাবু এই সময় হইতে নিজের কর্ত্তব্য ব্যতীত কণ্ট্রাক্টরের কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

কুলিরা যাদব বাবুর কথায় উঠিতে পারে ও বসিতে পারে। তাহারা যাদব বাবুর উন্নতির জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। যাদব বাবু কুলির সর্দ্দারগণকে ডাকিয়া নিজের কথা বলিলেন, এবং তাহারাও তৎক্ষণাৎ একবাক্যে বলিয়া উঠিল—আমরা এ পর্য্যন্ত আপনার নিকট উপকারই গ্রহণ করিতেছি, কখনও আপনার প্রত্যুপকার করিতে উদ্যত হই নাই। আমাদের পয়সা নাই যে, পয়সা দিয়া আপনার দুঃখ দূর করিব, তবে এবার আমরা সুযোগ পাইয়াছি। খাদের কাজ শেষ হইলে আমরা যে সময় আমোদে বা আহ্লাদে অতিবাহিত করি, সেই সময়ে ঘর তৈয়ারী করিয়া দিব, এবং ইহার জন্য কোনপ্রকার পারিশ্রমিক লইব না; এবার আমরা সময় পাইয়াছি, প্রত্যুপকার করিতে ভুলিব না।

বলা বাহুল্য, দেড়হাজার কুলির মধ্যে ঐ কথা। সুতরাং ঘর নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্বেই প্রস্তুত হইল। যাদব বাবুর একান্ত অনুরোধহেতু কুলিরা সামান্যমাত্র বেতন লইয়াছিল। সুতরাং অধিকাংশ অর্থই যাদবের গুণের পুরস্কারের জন্য থাকিয়া গেল।

এই ঘটনায় যাদবলাল এককালে নগদ ১৫০০৲ দেড়হাজার টাকা পাইয়াছিলেন।

যাদবলালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি গৃহে আসিবার উদ্যোগ করিলেন। বহুদিনের পর—সুদীর্ঘ তিন বৎসরের পর, নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া পিতার নিকট পত্র লিখিলেন। বাটীতে পত্র পৌঁছিবার দুইদিন পরেই যাদবলাল গৃহে পুনরাগমন করিলেন। তিনি পিতার জন্য একখানি তসরের কাপড়, মাতার জন্য ময়ূরকণ্ঠী শাটী ও নগদ ৫০০৲ পাঁচশত টাকা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পত্নী কুঞ্জবালার জন্য কিছুই আনেন নাই—তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিবেন—স্থির করিয়াছিলেন। স্বামীর গৃহে আসিবার বহু পূর্ব্বেই স্বামিগতপ্রাণা কুঞ্জবালা পতিকুলের যাবতীয় দুঃখভার মাথায় লইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। যাদবলাল সেই কুঞ্জবালার স্মৃতিরক্ষার জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে একটী কূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই কূপের জল নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর।

যাদব বাবু লাভপুরে আসিয়া দেখিলেন, লাভপুরে থানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও ডাকঘর হইয়াছে। লাভপুর ও মৌগ্রাম মুরশিদাবাদের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু ১৮৬১ খৃঃ অব্দে বীরভূমের অন্তর্গত হইয়াছে, তবে এখনও মৌগ্রামের নিকটস্থ দুই একটী মৌজার রাজস্ব মুরশিদাবাদে দিতে হয়।

লাভপুরে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া যাদব বাবু রাণীগঞ্জে

ফিরিয়া আসিলেন; এবং কয়েক মাস পরে বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির আমমোক্তার নিযুক্ত হইলেন। বেঙ্গল কোল্-কোম্পানি রাণীগঞ্জে সর্ব্বপ্রথমে কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া, পরে ক্রমোন্নতি সহকারে জমিদারী ক্রয় করিয়া এবং সময়মত অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আজ কাল বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির জমিদারী পত্তনী প্রভৃতির আয় —প্রায় দুইলক্ষ টাকা; যাদব বাবু যখন আমমোক্তার ছিলেন, তখন আয়—একলক্ষের অধিক ছিল না।

যাদব বাবুর অদৃষ্টে লেখা পড়া শিখা ঘটে নাই, সুতরাং আমমোক্তারের কার্য্য তিনি কিরূপে চালাইবেন? কুলির হিসাব রাখিবার সময় যাদব বাবু দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া হাতের লেখার উন্নতি সাধন করেন এবং জমা খরচে সুন্দররূপ জ্ঞানলাভ করেন। এখানে মধ্যে মধ্যে ইংরেজ কর্ম্মচারীর সহিত হিন্দীতে কথা বলিতেন—এইরূপ কথাবার্ত্তার ফলে তিনি ইংরাজী ভাষার কথা শুনিয়া তাহার সাধারণ অর্থ বুঝিতে পারিতেন। যাঁহার বুদ্ধি থাকে, তিনি সহজেই সংসারে অসাধ্য সাধনে সমর্থ হন।

আমমোক্তারের পর, তিনি নায়েবের পদে উন্নীত হন। অধস্তন কর্ম্মচারিগণের প্রতি তাঁহার স্নেহ অকৃত্রিম ছিল। উপরিতন কর্ম্মচারী সাধারণতঃ অধস্তন কর্ম্মচারিবর্গকে আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু যাদব বাবুর

ধারণা অন্য প্রকার। তাঁহার নিকট সামান্য বেতনের কর্ম্মচারীও যথেষ্ট সমাদর পাইতেন। যাদব বাবুর অধীনে কার্য্য করিয়াছেন এরূপ কর্ম্মচারী এখনও বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির সরকারে কার্য্য করিতেছেন। আমাদের নিকটে তাঁহাদের সকলেই যাদব বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সংসারে মানবের ক্ষমতা আর দৈবের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা কিরূপ, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। দুইজন লোক একসঙ্গে একই কাজ করিতে আরম্ভ করিল; তাহাদের কার্য্যের প্রণালী দেখিয়া কে কৃতকার্য্য হইবে, আর কে অকৃতকার্য্য হইবে, তাহা বলা অসম্ভব। তবে আমরা পরিণাম দেখিয়া বলিতে পারি, কেন একজন অকৃতকার্য্য হইয়াছে, অর্থাৎ আমরা তখন সান্ত্বনার জন্য কারণ নির্দ্দেশ করি। যখন কোন কারণ দৃষ্ট হয় না, তখন আমরা দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। কেহ কেহ বলেন, মানব পরমেশ্বরের যন্ত্র, তিনি মানবকে যেভাবে যে পথে লইয়া যান, মানব সেইভাবে সেই পথে চলিয়া যায়, তাহার নিজের কোন শক্তি নাই। সুতরাং ভাল বা মন্দ কার্য্যের জন্য মানব দায়ী নহে। যাদবলাল মধ্যে মধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতেন এবং কর্ম্মসমুদ্রে অবগাহন করিয়া সকল ভাবনা দূর করিতেন।

কণ্ট্রাক্টরের কর্ম্ম করিবার সময়ে ডিসেরগড় নিবাসী বাবু অম্বিকাচরণ লায়েকের সহিত তিনি বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন।

ইঁহারা দুইজনে পরামর্শ করিয়া স্বাধীনভাবে কয়লার খাদ করিবেন, স্থির করিলেন; এবং লায়েক মহাশয় অবিলম্বে নিজনামে কারবার খুলিয়া দিলেন। যাদব বাবু কারবার চলিবে কি না, এবং পরিণামে যদি না চলে, তাহা হইলে অন্নকষ্ট হইবে ইত্যাদি চিন্তা করিয়া সহসা কর্ম্মত্যাগ করিলেন না, "লায়েক কোল্ কোম্পানি" নাম দিয়া কণ্ট্রাক্টরের কার্য্যের মত অপর নামে কয়লার কারবার খুলিয়া দিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে যে কুঠী করেন, তাহার নাম ছোট ধূমা। পরে বরাকর বেগুনিয়া ও অন্যান্য স্থানে খাদ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

যাদবলালের অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয় বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির কয়েকজন কর্ম্মচারীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা ভাবিতেন—যাদবলালও কর্ম্মচারী আর আমরাও কর্ম্মচারী; যাদবলালের উন্নতি হইতেছে, তাঁহার রাশি রাশি টাকা জমিতেছে, আর আমাদের অদৃষ্টে কিছুই নাই। সুতরাং তাঁহারা ভাবিতেন—যাদবের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে না কেন? যাদব বাবু যেমন নিজে একজন নায়েবের অনুগত থাকিয়া কাজ শিখিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও একজন নিরন্নকে নিজের দৈন্যদশা ভাবিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই মহাত্মা যাদব বাবুর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, যাদব বাবুর ব্যবহার দেখিয়াও নিজের হৃদয়

পবিত্র করিতে পারেন নাই। ইনি আরও দুই একজন কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির এজেণ্টের নিকট যাদব বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির তৎকালীন ম্যানেজার সাহেব নবাগত, তিনি কোন কারণে * যাদব বাবুর উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে সুযোগ পাইয়া যাদব বাবুর বিরুদ্ধে প্রায় প্রত্যহই অভিযোগ করিয়া পত্র পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। যাদব বাবুর উপর বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির অংশীদারগণ ও এজেণ্টের গভীর বিশ্বাস ছিল, এবং সেই জন্য তাঁহারা যাদব বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাঠ করিয়া সেই অভিযোগের কোনও প্রতিবিধান না করিয়া যাদব বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। যাদব বাবু সেই সকল অভিযোগ পাঠ করিয়া মৌনাবলম্বনে থাকিতেন। অভিযোগকারীদিগকে দণ্ড দেওয়ান, বা তাঁহারা কেন অভিযোগ করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয়ে কোন সন্ধানই করিতেন না। যাদব বাবুকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেখিয়া শত্রুপক্ষ স্বকার্য্যসাধনে বিরত হইলেন না। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে অভিযোগ করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে ছয় মাস অতিবাহিত হইল, অবশেষে তিনি আর নিশ্চেষ্ট থাকা সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি নিজে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি পত্র লিখিলেন, এবং রাণীগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী

* কারণ কি, তাহা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সবিস্তর লিখিত হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের অন্যতম সুযোগ্য শিক্ষক গিরিশ বাবুকে দিয়া তাহার অবিকল অনুবাদ করাইলেন, এবং বরাবর এজেণ্টের নিকট সেই পত্র পাঠাইয়া দিলেন। পত্রখানি ডাকে দিয়াই তিনি ম্যানেজার সাহেবকে বলিয়াছিলেন—আপনি আমার বিরুদ্ধে ক্রমাগত লিখিতেছেন কেন? সাহেব তাহার কোন উত্তর না দিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। এজেণ্ট সাহেব যাদব বাবুর পত্র পাঠ করিয়াই ম্যানেজার সাহেবকে টেলিগ্রাম করিলেন। ম্যানেজার সাহেব টেলিগ্রামের সংবাদ অবগত হইয়া একজন কর্ম্মচারীকে ও তৎকালে সেখানে উপস্থিত শ্যামা নামে একজন নাপিতকে বলিয়াছিলেন—"আমি যদি যাদব বাবুর কথামত কাজ প্রথম হইতে করিতাম, তাহা হইলে আজ আমাকে পদচ্যুত হইতে হইত না।" পাঠকগণ, যাদব বাবুর কর্ত্তব্যপ্রিয়তা দেখুন! যাদব বাবুর উপর তাঁহার প্রভুগণের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, দেখুন! সেই বিশ্বাসের ফলে বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির এজেণ্ট সাহেব কোনও প্রমাণ না লইয়াই ম্যানেজার সাহেবকে পদচ্যুত করিলেন। এই ঘটনায় যাদব বাবুর শত্রুপক্ষ কয়েক মাসের জন্য চুপ করিয়া থাকিল।

নূতন ম্যানেজার সাহেব আসিলেন, এজেণ্টের পদেও কলিকাতায় নূতন লোক নিযুক্ত হইলেন। ইঁহারা যাদব বাবুর উপর সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট ছিলেন না। যাদব বাবুর বিপক্ষদল

আবার অভিযোগ আরম্ভ করিল। ম্যানেজার সাহেব নিরপেক্ষ থাকিয়া উভয়ের কার্য্যপ্রণালী দেখিতে লাগিলেন, এজেণ্ট সাহেবও আবেদনপত্রে লিখিত অভিযোগসমূহের সত্যাসত্যতা নির্ণয়ের জন্য স্বয়ং ঘটনাস্থলে একাধিক বার আসিয়াছিলেন। এবার বিপক্ষদলের আশা পূর্ণ হইল—এবার যাদব বাবুর পক্ষে বলিবার কেহ নাই। যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রধান তিনটী এবং এই তিনটীর জন্য ম্যানেজার সাহেব ও এজেণ্ট সাহেব যাদব বাবুকে আপনার নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

প্রথম অভিযোগ—কোম্পানির অর্থ আপনার কার্য্যে খাটান ও প্রজার নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ। এই অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার জন্য বিপক্ষগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় অভিযোগ—কণ্ট্রাক্টরের কর্ম্ম করা। যে দুই একজন কণ্ট্রাক্টরের কর্ম্মের কারণ জানিতেন, তাঁহারা তখন মৃত। আর একজন জানিতেন, তিনি যাদব বাবুর বিরোধী। সুতরাং এই অভিযোগে ম্যানেজার সাহেব ও এজেণ্ট সাহেব যাদব বাবুকে অপরাধী স্থির করিলেন; যাদব বাবু নির্দ্দোষতা প্রমাণের জন্য ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার সাহেবের আদেশপত্র দেখাইলেন—বিপদ্ কাটিয়া গেল। তৃতীয় অভিযোগ—নিজে কয়লার খাদ করিয়া বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির

ব্যবসায়ের ক্ষতি করা। এবার যাদব নিরুত্তর। ধর্ম্মভীরু যাদব মিথ্যা বলিলেন না—তিনি বলিলেন, এ বিষয়ে আমার লিপ্ত থাকার যদি কোন প্রমাণ থাকে, তবে আমি অপরাধী। কিন্তু এই অভিযোগের কোন আইন-সঙ্গত প্রমাণ না পাইলেও ম্যানেজার সাহেব এবং এজেণ্ট সাহেব বলিলেন—আইনের চক্ষে আপনি নিরপরাধ, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, আপনি অপরাধী। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা বলিলেন—আপনি অবিলম্বে কর্ম্ম ত্যাগ করুন; আর যদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কুঠীগুলি কোম্পানিকে প্রদান করুন। এদিকে যাদব বাবুর হিসাব নিকাশ লওয়া হইতে লাগিল।

যাদবলাল তখন বিষম চিন্তায় পতিত হইলেন। যাদবলালের তখন মাসিক খরচ প্রায় দুই হাজার টাকা। কর্ম্মত্যাগ করিলে অনাহারে ক্লেশ পাইতে হইবে। এইরূপ বিবেচনার পর তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না স্থির করিলেন, এবং কুঠীগুলি কোম্পানিকে দিতেও প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে মনে হইল—বিপদে বন্ধুর বাক্য শুনিতে হয়, এ বিষয়ে লায়েক মহাশয়ের সহিত পরামর্শ আবশ্যক। অভিন্নহৃদয় বন্ধু অম্বিকাচরণ বলিলেন—"অবিলম্বে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করুন—আপনার বাটীর খরচ চালাইবার ভার আমি লইলাম। এই বলিয়া একটী যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ দিয়া যাদব বাবুর

প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিলেন। তিনিও বন্ধুর বাক্য শিরোধার্য্য জ্ঞান করিয়া বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাদব বাবু "লায়েক ও ব্যানার্জ্জি কোল্ কোম্পানি"র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার দক্ষতায় এই কোম্পানি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। যাদব বাবুর তখন আর অর্থের অভাব রহিল না। যে যাদব বাবু অর্থের জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, আজ তিনি লক্ষপতি। আজ তাঁহার ভাগ্য-গগনে সুখ-সূর্য্য প্রবল প্রতাপে বিরাজ করিতেছে। যাঁহারা যাদব বাবুর ভাগ্যোদয় দেখিয়া, আপন আপন ভাগ্যোদয় কামনা করেন, তাঁহারা যাদব বাবুর মত গুণবান্ হইতে চেষ্টা করুন। জগতে গুণের আদর চিরকাল, এবং গুণীর ভাগ্যোদয়ও অবশ্যম্ভাবী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কীর্ত্তি-কলাপ

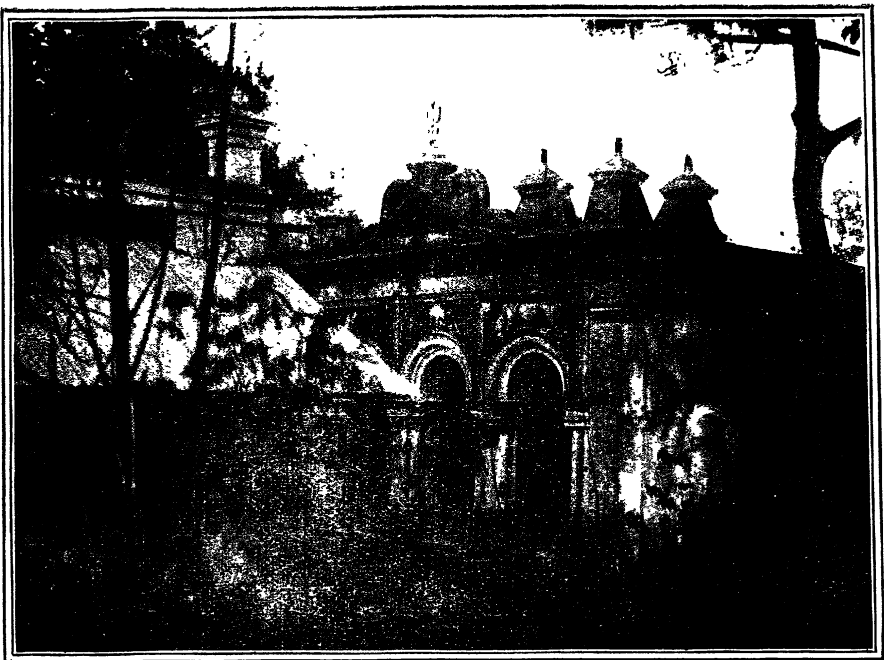
মানব-দেবতার হৃদয় লোকের দুঃখ দেখিয়া দ্রবীভূত হইয়া থাকে। তাঁহারা তখন সেই ভাবের ঘোরে থাকিয়া সুবিমল আনন্দ উপভোগ করেন, এবং এই আনন্দই তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া পরোপকাররূপ মহাব্রত সম্পাদনে দীক্ষিত করে। আমরা জগতে যে সকল পুণ্যকাহিনী শুনিতে পাই, এবং জগতে যে সকল কীর্ত্তিমন্দির দেখিয়া বিমোহিত হই, সেই সমুদায় ঐরূপ এক একটী উত্তেজনার সুমধুর ফল।

যাদবলাল বাল্যকালে অপরাপর বালকের মত তপোবনতুল্য ফুল্লরাধামে উপনীত হইতেন। ফুল্লরাদেবীর গৃহপ্রাঙ্গণে আমোদ আহ্লাদ করিতেন ও সময়মত বাটীতে ফিরিতেন। পরে তিনি যখন আপনাদের অবস্থা ও সুখদুঃখের পরিমাণ কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিলেন, তখন কখন কখন মনের জ্বালা জুড়াইবার জন্য শান্তিরসাস্পদ তপোবনতুল্য ফুল্লরাধামে উপনীত হইয়া মনের দুর্ব্বলতা দূর করিতেন।

ফুল্লরা দেবীর পীঠস্থান লাভপুর গ্রামের পূর্ব্বে অবস্থিত। লাভপুরনিবাসী দ্বিজবংশগৌরব শ্রীযুক্ত কুমুদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লাভপুর-যাদবলাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জনৈক সুযোগ্য শিক্ষক সহৃদয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় ফুল্লরা-মহাপীঠের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্কলিত পুস্তক হইতে ফুল্লরা দেবীর বিবরণ সংক্ষেপে সাধারণের অবগতির জন্য লিখিত হইল।

ফুল্লরা মহাপীঠ। এই স্থানের পূর্ব্বনাম অট্টহাস। অট্টহাসে সতীর ওষ্ঠ পতিত হইয়াছিল, এখানে বিশ্বেশ ভৈরব বিদ্যমান। মহাপীঠের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে সুগভীর-পঙ্ক-সমন্বিত সুবিস্তীর্ণ জলাশয় বিদ্যমান। পূর্ব্বে এই জলাশয়ে নীলপদ্ম প্রস্ফুটিত হইত। এই জলাশয়ের পঙ্ক-মধ্যে নৌকার অসংখ্য ভগ্নাংশ আজিও পরিদৃষ্ট হয়।

এই মহাপীঠের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে যোগিনীতলা বিদ্যমান—যোগিনীতলা সাধুগণের সাধনার স্থান। মহাপীঠের ঈশান কোণে যুদ্ধডাঙ্গা নামে বিখ্যাত একটী স্থান পতিত থাকিয়া দর্শকের মনে কোন দেবাসুর-সংগ্রামের রণভূমির কথা স্মরণ করাইয়া থাকে। ফুল্লরা দেবীর পূজার প্রচার ও পূজা মৈথিল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের দ্বারা অনুষ্ঠিত। সম্প্রতি যিনি পূজা করিতেছেন, তিনিও মৈথিল। দেবীর পূজায় একটু বিশেষত্ব আছে। শিবাভোগ না হইলে



শ্রীশ্রীফুল্লরা দেবীর মন্দির

[৫৭ পৃঃ

অর্থাৎ কয়েকটী শৃগাল পুরোহিত-প্রদত্ত পূজোপকরণ ভক্ষণ না করিলে দেবীর পূজা হয় নাই বুঝিতে হইবে।

ফুল্লরা দেবী একটী ফলপুষ্পহীন বৃক্ষের তলায় অর্চ্চিত হইতেন। ফুল্লরা দেবীর গদিয়ান্ কৈলাস গিরির সময়ে ঐ বৃক্ষটী ঝড়ে উৎপাটিত হইলে সাধারণের অর্থে একটী ক্ষুদ্রায়তন মন্দির নির্ম্মাণের উদ্যোগ হয়। নারায়ণ গিরি দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ শেষ করাইয়া একটী শিবমন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই শিবমন্দিরটী এখনও বিদ্যমান। এই মন্দিরের লিখিত সময় সন ১২৫৯ সাল। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাবু ও শ্রীযুক্ত কুমুদীশ বাবুর প্রাথমিক চেষ্টায় এবং সাধারণের সাহায্যে বঙ্গীয় সন ১৩০৬ সাল হইতে এখানে মাঘী পূর্ণিমায় দেবীর মহাপূজা ও মেলা মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইতেছে। ফুল্লরা দেবীর মন্দির ও তন্নিকটবর্ত্তিস্থান এখনও নিবিড় জঙ্গলে আবৃত, তবে মধ্যে মধ্যে মানব-সমাগম হয় বলিয়া জঙ্গলের সমুন্নতি ঘটে নাই। যাদবলাল বাল্যকালে মনের জ্বালা জুড়াইবার জন্য কখন কখন এই জনহীন স্থানে আসিতেন, এবং বলিতেন—"মা! আমার অদৃষ্ট যদি কখনও সুপ্রসন্ন হয়, তবে তোমার মন্দিরের সুব্যবস্থা করিব।"

আমাদের বোধ হয়, ফুল্লরাদেবী যাদবলালের কথা সকল শুনিয়াছিলেন। ভক্তাধীনা ভগবতী ভবানী ভক্তের জন্য—ভক্তের

মঙ্গলের জন্য সতত ব্যস্ত। আমরা যখন যে প্রকার প্রার্থনা করি, তিনি তখনই তাহা জানিতে পারেন ; কিন্তু সকলের সকল আশা পরিপূর্ণ করেন না। তবে কি দেবী আমাদের মত মধ্যে মধ্যে অবিচার করেন ? দেবী যদি সুবিচারই করেন, তবে সকলের বাসনা পূর্ণ হয় না কেন ?

আমাদের বোধ হয়—আমরা যে ভাবে প্রার্থনা করিতে হয় তাহা জানি না—অথবা আমাদের প্রার্থনীয় বস্তু প্রতিমুহূর্ত্তেই একরূপ থাকে না। আমরা প্রার্থনার সময় কখন কখন মনের কুটিলতাও পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমরা পূর্ব্বাহ্নে যাহা প্রার্থনা করি, মধ্যাহ্নে তাহা চাই না ; আবার মধ্যাহ্নে যাহা চাই, সায়াহ্নে তাহা চাই না অর্থাৎ আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন নূতন বস্তুর প্রার্থনা করিয়া থাকি। আমাদের মত এই যে, এই প্রকার অসঙ্গত প্রার্থনা পরিপূর্ণ না হওয়াই উচিত। কোন খল প্রার্থনার সময় বলিয়াছিল—"দেবি, আমায় দয়া ক'রে একলক্ষ টাকা দাও, আমি তোমার দশটাকার পূজা দিব। মা ! আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তবে দশটাকা কাটিয়া লইয়া এক লক্ষ টাকাই দাও।" বল দেখি পাঠক, এইরূপ প্রার্থনা পরিপূর্ণ হওয়া অনুচিত নহে কি ?

যাঁহাদের জীবন ও ধন পরোপকারের জন্য, দরিদ্রের ভরণ-পোষণের জন্য, কমলা চঞ্চলা হইলেও তাঁহাদের গৃহে অচলা।



শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা [৫৭ পৃঃ

যাদবলাল ফুল্লরার চরণ স্মরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে বহির্গত হইয়াছিলেন, দেবীও তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। যাদবলালও অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—তিনি ফুল্লরা-দেবীর ক্ষুদ্র গৃহটী ভাঙ্গিয়া একটী নূতন ও বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ কবিয়া দিয়াছেন। লাভপুরনিবাসী জমিদার স্বর্গীয় বাবু হিরণ্য-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুকুরের ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। যাদবলাল ঐ ঘাটের উভয় পার্শ্বে শিবস্থাপনা করিয়াছেন।

দেবীর নাটমন্দির প্রস্তুত করিবার জন্য যাদবলালের বাসনা বলবতী ছিল, তবে তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার আশা ফলবতী দেখিতে পান নাই। তাঁহার সুযোগ্য সন্তানগণ পিতার আদেশ মতই নাটমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

অন্নপূর্ণা দেবীর আরাধনার জন্য তিনি নিজ বাটীতে দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূজার পর সেখানে অতিথি ও অভ্যাগত এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে যথারীতি খাওয়ান হয়। পাঠকগণ, এই ব্যাপারটী অনন্যসাধারণ নহে, অনেক বড়-লোকের বাড়ীতেই এইরূপ বন্দোবস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং এই অনুষ্ঠানে যাদব বাবুর দূরদর্শিতা বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় সবিশেষ কিছুই নাই।

ঠাকুরবাড়ী ও তথায় অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ—এই বিষয় লইয়া—একবার আমাদের কোন বন্ধুর সহিত এই

লেখকের বাদানুবাদ ঘটিয়াছিল। সেখানে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, এখানে তাহাদের কয়েকটী লিখিত হইল। আশা করি, এই সকল যুক্তি পাঠ করিয়া সাধারণে লাভপুরের ঠাকুরবাড়ীতে অন্নবিতরণের আবশ্যকতা, সুতরাং যাদব বাবুর দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তা, বুঝিতে পারিবেন।

লাভপুর সহর নয়, এখানে হোটেল নাই অর্থাৎ এখানে অন্নবিক্রয়ের ব্যবস্থার অভাব। সুবিধামত ও সময়মত রাঁধিয়া খাইবার ব্যবস্থা করাও চলে না, কারণ তখন লাভপুরে এই সকল উদ্দেশ্যে প্রস্তুত গৃহের একান্ত অভাব ছিল। লাভপুরে থানা, ডাক-ঘর, সব্‌ রেজিষ্টরী আফিস ও জমিদারগণের কাছারি প্রভৃতি আছে বলিয়া নানা দেশের নানা ভাবের লোক নানা কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়া থাকেন। কার্য্য শেষ হউক বা না হউক, তাঁহারা এখানে সময়মত পান-ভোজনের অভাব অনুভব করেন। কোন জমিদারের বাটীতে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না—একথা সত্য হইলেও তাঁহারা জমিদারবর্গের বাটীতে যাইবেন কেন? তাঁহারা নিজের কার্য্যের জন্য লাভপুরে আসিয়াছেন, এরূপ স্থলে তাঁহারা জমিদারবর্গের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন কেন? কিন্তু তাঁহারা যদি ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হন, অথবা তাঁহারা যদি অনিমন্ত্রিত হইয়াই ঠাকুরবাড়ীতে মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হন, তাহা হইলে

তাঁহাদের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে, অথচ তাঁহাদিগকে অনর্থক উপবাসজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। এইরূপ অন্ন গ্রহণ করিলে দাতা বা গ্রহীতার মনে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার বন্ধন জন্মে না, অথচ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমানরূপে সুখী হইয়া থাকেন। সুতরাং উপযুক্ত স্থলে ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধারণের যে কত উপকার সাধিত হয়, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব।

অনুপযুক্ত স্থলে এই শ্রেণীর ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধারণের উপকার না হইয়া অপকারই ঘটে। ইহার দৃষ্টান্তও দুর্ল্ভ নহে। বীরভূম জেলার অন্তর্গত ডাবুক একটী সামান্য গ্রাম। এই গ্রামের অধিবাসীদিগের অধিকাংশই মুসলমান; কয়েক ঘর মাত্র হিন্দু। কৈলাসপতি নামে বিখ্যাত একজন সাধু এখানে ডাবুকেশ্বর শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, এবং সেই মন্দিরসংলগ্ন একটী প্রকাণ্ড দালান প্রস্তুত করাইয়াছেন। এই দালানে অন্ততঃ একশত লোক স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। ডাবুকেশ্বর শিবের পূজার পর প্রত্যহ ৩২ জন লোক প্রসাদ পাইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই, যে ৩২ জন লোক প্রত্যহ উপস্থিত হয়, তাঁহারা সকলেই গৃহস্থ—ডাবুক ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী। ডাবুক গ্রাম কোন বড় রাস্তার উপর স্থাপিত নয়, এখানে কোন মহাজন বা সাধারণের দৃষ্টি-

আকর্ষক কোন বস্তু বিদ্যমান নাই—অথচ ডাবুকে অকাতরে অন্নদান চলিতেছে।

যাঁহারা এখানে অন্ন গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ক্ষুধার তাড়নায় আসেন না, অথবা কোন কার্য্যের ব্যপদেশেও আসেন না, তাঁহারা আসেন—কেবলমাত্র অন্ন গ্রহণ করিতে। এইরূপ অন্নদানের ফলে ডাবুকের ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামের বালকেরা অনায়াসলভ্য অন্নের বিষয় ভাবিয়া উন্নতির কোন চেষ্টাই করে না। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় এইরূপ অস্থানে অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা ভাল হয় নাই। দাতা সতত দান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু যিনি গ্রহণ করিবেন, তাঁহার একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। দানের গ্রহণে পাপ আছে—কিন্তু দানে নাই।

লাভপুরে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা যাদবলালের আর একটী কীর্ত্তি। এখানে একজন সুযোগ্য চিকিৎসক থাকেন। লাভপুর ও তথা হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহে সুযোগ্য চিকিৎসকের একান্ত অভাব। বীরভূম জেলার প্রধান নগর সিউড়ি ও রামপুরহাট ব্যতীত সুযোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শলাভ সাধারণের অদৃষ্টে ঘটে না। সুতরাং সবিশেষ অর্থব্যয় করিতে না পারিলে অনেক রোগের প্রতিকার হয় না। লাভপুরে একজন সুযোগ্য চিকিৎসকের উপস্থিতি হেতু এক্ষণে অনেকেরই সুবিধা হইয়াছে বলিতে হইবে।

বীরভূম জেলায় সুযোগ্য চিকিৎসকের একান্ত অভাব—তাহার কারণ—এখানকার জলবায়ু নিতান্ত মন্দ নয়; মধ্যে মধ্যে ম্যালেরিয়া, বসন্ত বা কলেরা কোন কোন স্থানে প্রবল হইলেও তুই তিন মাসের অধিক ঐ সকল পীড়ার প্রাবল্য সেখানে থাকে না। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র, তাহারা উপবাস করিয়া জ্বর তাড়াইতে বাধ্য হয়। তাহারা দরিদ্র, ঔষধের পয়সা কোথায় পাইবে? স্থানীয় লোকেরাও নিরীহ এবং কৃষিপ্রিয়, তাহারা সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া চাষে মন দেয়, ডাক্তারি কবিরাজি প্রভৃতি শিখিতে চায় না; তবে আজকাল তুই একজন ডাক্তারি পড়িতে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল কারণে এখানে কোন সুযোগ্য চিকিৎসক স্বেচ্ছায় থাকিতে চান না; যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যবসা বারমাস চলে না। আমাদের বোধ হয়, এইজন্য এখানে সুযোগ্য চিকিৎসকের একান্ত অভাব।

লাভপুরে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সাধারণের যে কি উপকার হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এই পুস্তকের লেখক যখন লাভপুর-যাদবলাল উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পড়িত, তখন একদিন লাভপুরের এক জমিদারের তুইটী সন্তান তর্ক-বিতর্ক করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠের বয়স ১৯।২০

বৎসর, তিনি ঘটনার সময়ে পত্র লিখিতেছিলেন, আর তাঁহার কনিষ্ঠ একটী কলম কাটিতেছিলেন। কনিষ্ঠের বয়স ১৪।১৫। তাঁহারা অশিষ্ট, অভদ্র বা অজ্ঞ নহেন; তবে দৈবের গতি বিচিত্র বলিয়া সে দিন তাঁহাদের তর্ক বিতর্ক বিবাদে পরিণত হইয়াছিল। এই বিবাদের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কনিষ্ঠ ক্রোধের বশীভূত হইয়া ছুরিখানি জ্যেষ্ঠের বক্ষে বাম-স্তনের কিঞ্চিৎ নিম্নে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন, এবং পর মুহূর্ত্তেই "হায় কি করিলাম!" বলিয়া ক্রন্দন ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ছুরিখানি সযত্নে উত্তোলিত হইলে প্রবলবেগে রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল।

বলুন দেখি পাঠক, তখন সেখানে একজন সুযোগ্য চিকিৎসকের কিরূপ প্রয়োজন? সেই সময়ে যদি বিশ বা পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া চিকিৎসক আনিতে হয়, তাহা হইলে এই প্রকার পীড়িতের পরিণাম কি হয়? আপনারা যদি বলেন—পরমেশ্বর রক্ষাকর্ত্তা, যাহার পরমায়ু আছে, তাহাকে মারে কে? তাহা হইলে আমরা নিরুত্তর—আমাদের আর বলিবার কিছুই নাই।

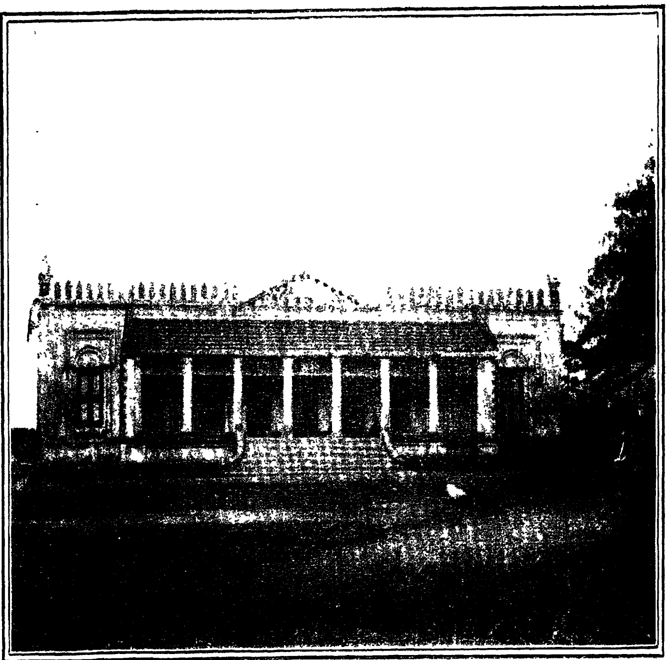
পরমেশ্বরের কৃপায় সেই আহত ব্যক্তি, স্বহস্তে আহত স্থান চাপিয়া ধরিয়া যাদবলাল-প্রতিষ্ঠিত চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সরীতে উপস্থিত হইয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে সুযোগ্য ডাক্তার

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদিগকে ডাকিলেন। লাভপুর যাদবলাল উচ্চ ইংরাজী স্কুলের সুযোগ্য হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ নিয়োগী বি, এ, মহোদয় উপস্থিত হইলেন। আহত স্থানটী পরিষ্কার করিয়া ডাক্তার বাবু সেলাই করিয়া দিলেন এবং কয়েক দিন চিকিৎসার পর জমিদারতনয় সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে এইরূপ চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়; কিন্তু তাহা কয়জনে বুঝেন?

হিন্দুধর্ম্মে যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি বলিবেন—জন্মগ্রহণ করিলেই জাত ব্যক্তিকে তিনটী ঋণে জড়িত হইতে হয় এবং সেই তিনটী ঋণ পরিশোধের জন্য যত্ন করিতে হয়। প্রথম ঋণ—বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া পরিশোধ করিতে হয়; এই ঋণের নাম ঋষিঋণ। দ্বিতীয় ঋণ—পুত্রোৎপাদন করিয়া, সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া, পরিশোধ করিতে হয়; এই ঋণের নাম পিতৃ-ঋণ। তৃতীয় ঋণ—যাগ যজ্ঞাদি দেবপূজা করিয়া পরিশোধ করিতে হয়; ইহার নাম দেব-ঋণ। যাদব বাবু দেব-ঋণ পরিশোধের জন্য রাধা-কৃষ্ণ ও অন্নপূর্ণা দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও তাঁহাদের পূজার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। অপুত্রাবস্থায় প্রথম পত্নীর বিয়োগ ঘটিয়াছিল বলিয়া তিনি

নাকড়া-কোন্দার জমিদার-বাটীতে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন এবং এই পত্নীর সাহায্যে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত পুত্র কন্যাদি রাখিয়া পরলোকে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু বাল্যকালে বেদাদি দূরের কথা, সামান্য লেখা পড়াও শিখিবার সুযোগ পান নাই; সুতরাং ঋষিঋণ সুদে মূলে একত্র হইয়া ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের বোধ হয়, তিনি এই সকল বিবেচনা করিয়া "গণেশচতুষ্পাঠী", "জগদম্বা বালিকাবিদ্যালয়" ও "যাদবলাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করিয়া ঋষিঋণ পরিশোধের জন্য কিস্তীবন্দি করিয়াছেন। বর্ষে বর্ষে শত শত বালক-বালিকা শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধের সহায় হইতেছে। পিতার নামে চতুষ্পাঠী, পত্নীর নামে বালিকাবিদ্যালয় ও নিজের নামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পুস্তকের লেখক লাভপুর চতুষ্পাঠী হইতে কাব্যের পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং সে এই চতুষ্পাঠীর সর্ব্বপ্রথম ছাত্র। উপযুক্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধারমণ বেদান্ততীর্থ মহোদয় চতুষ্পাঠীর স্থাপনাবধি এখনও অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন।

যাদবলাল এই সকল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন



যাদবলাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

[৬৭ পৃঃ

নাই। দরিদ্র অথচ বুদ্ধিমান্ ছাত্রগণের সুবিধার জন্য বিশিষ্ট বৃত্তিদানের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। এই লেখক এইরূপ একটী বৃত্তি লাভ করিয়া লাভপুর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিল।

ডাক্তারখানা, বিদ্যালয়, দেবসেবা প্রভৃতি সুপরিচালন জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণও সেই সমস্ত কীর্ত্তিরক্ষায় সবিশেষ মনোযোগী আছেন।

লাভপুরে "গোবিন্দ সায়র" নামক পুষ্করিণী খনন তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইলে এই পুষ্করিণীর খনন কার্য্য আরম্ভ হয়, সুতরাং তিনি ইহার সমাপ্তি দেখিয়া যান নাই। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ যথারীতি খননাদি শেষ করাইয়া তাঁহার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিয়াছেন, বরং তাহা হইতে কিছু বেশীই করিয়াছেন। এই পুষ্করিণী খনন করিবার সময়ে একটী বাসুদেব-মূর্ত্তি বহির্গত হইয়াছিল। কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-মন্দিরে অথবা কলিকাতার যাদুঘরে বৌদ্ধযুগের যে বাসুদেব-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এই মূর্ত্তিটীও সেই প্রকারের। এই মূর্ত্তিটী সুপরিষ্কৃত হইয়া যথারীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং নিত্যপূজার ব্যবস্থা হওয়াতে প্রত্যহই পূজিত হইতেছে। যতদিন লাভপুর গ্রামে এই সকল কীর্ত্তিমন্দির বিরাজ করিবে, ততদিন যাদবলালের স্মৃতি সাধারণের হৃদয়ে জাজ্বল্যমান থাকিবে। যাদবলালের মত কতশত লোক অর্থ-

লাভ করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন সেই অর্থের এইরূপ সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেছেন ? জীবন, যৌবন ও ধন স্থায়ী নয় ; কিন্তু ঐ সকলের সমবায়ে যদি কোন কীর্ত্তি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহা সুদীর্ঘকাল অবিনশ্বর থাকে।

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"স জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।
অযশোঽকীর্ত্তিসংযুক্তো জীবন্নপি মৃতোপমঃ॥"

পাঠকগণ, আপনারা যদি কখন লাভপুরে শুভাগমন করেন, তাহা হইলে, আমাদের অনুরোধ, যাদব বাবুর কীর্ত্তিমন্দির দেখিতে বিস্মৃত হইবেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নানাকথা

মানবের মানবত্ব বুঝিতে হইলে সামান্য সামান্য ঘটনা সকল লক্ষ্য ও প্রত্যক্ষ করিতে হয়। মানুষ যখন মানুষের সহিত কথা কয়, তখন অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে, আপনার বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না; সুতরাং সে সময়ে শ্রোতা তাহার ভাবে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। এই হেতু আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি, সাবধান হইয়া কথা বলিলে, কে সাধু, কে চোর, কে বিদ্বান্, কে মূর্খ, তাহা কি কেহ সহজে নির্ণয় করিতে পারে? মানব যখন সহজভাবে কথা কয়, শিশুর সমান সে যখন আপনার মনের কথা আপন মনেই প্রকাশ করিতে থাকে, অথবা সে যখন সরলভাবে সাধারণের সহিত কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহার প্রকৃত মূল্য বাহির হইয়া পড়ে; তখনই সে কেমন লোক, তাহা অনায়াসে জানা যায়। থিয়েটারে বা যাত্রায় "সীতার বনবাসে"র পালায় যে যুবক বা যুবতী সীতা সাজিয়া অভিনয় করে, তাহার চরিত্র

যে সত্য সত্যই সীতার মত, তাহা আমরা মনে করিতে পারি না। যদি সেই যুবক বা যুবতির প্রকৃত চরিত্র জানিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সে যখন সাজঘরে থাকিবে, সীতার সাজ পরিত্যাগ কারয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবে ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তাহার প্রকৃত মূল্য নিরূপণের সময় পাওয়া যাইবে, নতুবা নহে।

যাদবলালের জীবনে যে সকল সামান্য সামান্য ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই সকলের কতকগুলি এই পরিচ্ছেদে লিখিত হইল। পাঠকগণ এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া, তিনি কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে আমরা ভাল বা মন্দ কিছুই বলিব না, অথবা এমন কোন কথাই বলিব না—যাহাতে আপনাদের মনে যাদব বাবুর চরিত্র বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচার অসম্ভব হইবে। তবে যদি কোন স্থলে, কোন বিষয়ে আমরা কোন কথা বলি, তাহা আমাদের মন্তব্য মাত্র; আপনারা সেই অংশ পড়িয়া নিরপেক্ষ বিচারের বিষম বিপক্ষতা সাধিত হইতেছে—এরূপ মনে করিবেন না।

যাদবলাল বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে শান্তিরসের পূর্ণ সরোবর ফুল্লরা দেবীর আনন্দধামে উপস্থিত হইতেন ও মনের জ্বালা জুড়াইয়া ঘরে ফিরিতেন।

যাদব বাবু যখন বেঙ্গল কোল কোম্পানির নায়েবের পদে উন্নীত হন, তখন কয়েকটী বালককে আশ্রয় দিয়া লেখা পড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লাভপুর নিবাসী বাবু ভবতারণ মুখোপাধ্যায়, নাকড়াকোন্দা নিবাসী বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুলতানপুর নিবাসী বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর নিবাসী বাবু বিন্দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ভাড়া নিবাসী বাবু করালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদব বাবুর সাহায্যে বিদ্যালাভের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

বাবু ভবতারণ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার আদেশ টেলিগ্রাম যোগে পাইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পরীক্ষা দিয়াই তিনি পীড়িত হইয়াছিলেন, এই পীড়াতেই তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি যখন তারযোগে সংবাদ পান, তখন তাঁহার পীড়া সমধিক প্রবল ছিল। আমাদের বোধ হয়—মানসিক উত্তেজনার বশে সহসা মৃত্যুলাভ ঘটিতেও পারে।

বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর আগরা সেণ্ট জন্ কলেজে প্রফেসরের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি যাদব বাবুর উপদেশে ও অবশেষে

অনুরোধে প্রফেসরের পদ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন ; এবং এই ব্যবসায়ে তাঁহার আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছে। আমাদের বোধ হয়, প্রফেসরের পদে থাকিলে এত দূর আর্থিক উন্নতি লাভ অসম্ভব হইত। ইনি আজকাল গুণে ও গৌরবে বীরভূম জেলার একটী রত্ন।

বাবু বিন্দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; এবং সুযোগ্য শিক্ষক বলিয়া প্রশংসালাভও করিয়াছিলেন। সম্প্রতি পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

কোন এক সময়ে যাদব বাবুর ইংরাজী শিখিবার বাসনা বলবতী হইয়াছিল। তিনি তখন অবিনাশ বাবুর নিকট শান্ত ও শিষ্ট শিশুর মত পাঠ দিতেন ও পাঠ লইতেন।

রাণীগঞ্জের বাজারে হিন্দুগণ সমবেত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করেন—এরূপ কোন স্থান তৎকালে ছিল না। বাবু যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গীয় বাবু রসিকলাল হালদার ও স্বর্গীয় বাবু নটবর পাল প্রভৃতি মহাজনবর্গের সাহায্যে একটী হরিসভা স্থাপন করেন। তাঁহাদের উদ্যোগে বিগত ১৮০৪ শকাব্দে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকায় গোবিন্দজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও নিত্যপূজার সুব্যবস্থা হইয়াছে। যে কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুসন্তান রাণীগঞ্জে আসিয়া দুই একদিন এই সভা-

গৃহে যাহাতে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। হরিসভার স্থাপনাবধি বাবু যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিক সাহায্য দিয়া হরিসভার ব্যয়ের কিয়দংশ বহন করিয়াছেন। যাদব বাবুর পুত্রগণ আজ পর্য্যন্ত মাসিক সাহায্য যথারীতি দিয়া পিতার গৌরব রক্ষা করিতেছেন।

মৌগ্রাম নিবাসী বাবু আশুতোষ সরকার যাদব বাবুর একান্ত অনুগত ছিলেন এবং তিনিও সেইজন্য নিজের তহবিল হইতে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা খরচ করিয়া আশুবাবুর বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাদব বাবুর কৃপাদৃষ্টি না হইলে আশু বাবুর অদৃষ্টে পত্নীলাভ ঘটিত কি না সন্দেহস্থল ছিল।

দুঃখের বিষয় এই যে, বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই আশু বাবুর পত্নী হেমচন্দ্রিকা দেবী সাজান বাগান ভাঙ্গিয়া দিয়া পরলোকে পলায়ন করিলেন। আশু বাবু পত্নীর নাম রাখিয়াছিলেন হেমচাঁদ। গৃহিণীবিহীন সংসার অরণ্যের তুল্য। আমাদের বোধ হয়, আশু বাবু সেইজন্য কয়েকদিন শোকে অতীব কাতর ছিলেন। শোকের বেগ কিঞ্চিৎ কমিলে, আশু বাবু একদিন প্রাতঃকালে যাদব বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং গান ধরিলেন—"আগে কেন হেমচাঁদ ম'ল-—অভাগা আশুর মরণ হ'ল না।" এই গানের ভাবে ও সুরে যে করুণরস বা বিষাদ-বিষয় বর্ণিত ছিল, তাহাতে তৎকালে সকল শ্রোতাই

অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। যাদব বাবু পুনরায় পাঁচশত টাকা ব্যয় করিয়া আশু বাবুর বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন—আশু বাবু আবার গৃহী হইলেন।

যে সকল কর্ম্মচারীর বেতন সামান্য, তাঁহারা প্রায়ই ভাল করিয়া আহারাদি করেন না। ইহার কারণ—অর্থের অভাব; আর ইহার পরিণাম—স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। যাদব বাবু এই ব্যাপারটী যেরূপ বুঝিতেন, আজকাল অন্য কোন পদস্থ কর্ম্মচারী সেরূপ বুঝেন না এবং বুঝিতেও পারেন না। যাদব বাবুর অধীনে যাঁহারা কর্ম্ম করিতেন, সবিশেষ কোন আপত্তি না থাকিলে তিনি তাঁহাদের ভোজনাদির ব্যবস্থা করিতেন এবং সকলে একত্র বসিয়া আহারাদি করিতেন। তাঁহার আদেশ ছিল—সকলে একসঙ্গে আহার করিবেন। একদিন রাণীগঞ্জের বাসায় দুগ্ধের অনটন ঘটিয়াছিল; সে দিন সামান্য পরিমাণে দুগ্ধ সংগৃহীত হইয়াছিল। আহারের সময় পাচক ঠাকুর ভাবিলেন—আজ আর এই দুগ্ধ কাহাকেও না দিয়া যাদব বাবুকে ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে দিবেন। পাচক ঠাকুর যথাসময়ে তাহাই করিলেন; যাদব বাবু দেখিলেন যে, দুগ্ধ কেবলমাত্র তিনি ও তাঁহার পুত্র পাইয়াছেন, আর কেহই পান নাই। তিনি তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া দুগ্ধের বাটীটী দূরে নিক্ষেপ করিলেন ও বলিলেন, "ষষ্ঠী, তুমি যদি আমার পুত্র হও, তবে তুমিও



রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ

[৭৫ পৃঃ

আমার মত কার্য্য করিবে।" জ্যেষ্ঠপুত্র ষষ্ঠীকিঙ্কর তৎক্ষণাৎ পিতার আদেশ প্রতিপালন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যাদব বাবু বলিলেন—"যেমন থাকে তেমনই সকলকে দিবে, এক হাতা করিয়া দিতে না পার, এক চামচ করিয়াও দিবে; ফলকথা, যে জিনিস আমাকে দিবে, তাহা যেন আমার সকল কর্ম্মচারীই খাইতে পায়।"

যাদব বাবুর এক সময়ে কয়েকদিনের জন্য ব্যয় সঙ্কোচ করা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী যতদূর পারেন, ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা করিলেন। যাদব বাবু এই সময়ে বাটীতে ছিলেন। কি ভাবে ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা হইল, তাহা তিনি জানিতেন না। সহসা একদিন রাণীগঞ্জে উপস্থিত হইয়া দৈনিক খরচের হিসাব পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষার পর বলিলেন—"আমার কর্ম্মচারিগণের জলখাবার খাতে খরচ লেখা হইল না কেন?" প্রধান কর্ম্মচারী বলিলেন—"ব্যয় সঙ্কোচ হেতু আজকাল কর্ম্মচারীদিগকে জলখাবার দেওয়া হয় না।" এই উত্তর শুনিয়া তিনি কিয়ংক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন, পরে সেই দিন বিকালে ৫টার সময় কর্ম্মচারিগণকে পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইলেন এবং বলিলেন—"না খাইয়া খরচ কম করা আমার উদ্দেশ্য বা আদেশ নয়; ভবিষ্যতে যেন আর এরূপ না ঘটে।"

যাদব বাবুর অভূতপূর্ব্ব উন্নতি দেখিয়া কয়েক জন কর্ম্মচারী

অন্তরে অন্তরে যাদব বাবুর সর্ব্বনাশ সাধনে সচেষ্ট হইলেন। সময় পাইলেই তাঁহারা বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির ম্যানেজার সাহেবের নিকট যাদব বাবুর অযথা নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। ম্যানেজার সাহেব যাদব বাবুকে উত্তমরূপে জানিতেন, সুতরাং তিনি যাদব বাবুর নিন্দা শুনিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, কাহাকেও কিছু বলিতেন না বা কিছু করিতেন না। এই সময়ে একজন নূতন লোক ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনি কর্ম্মচারিবর্গের কাহাকেও সবিশেষ জানেন না; সুতরাং যিনি যাহা বলেন, তাহাই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইনিও যাদব বাবুর অযথা নিন্দা শুনিয়া প্রথমে নিজের কোন মত প্রকাশ করেন নাই।

এই ম্যানেজার সাহেব নিজের স্বার্থের জন্য একদিন যাদব বাবুর নিকট একটা অন্যায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যাদব বাবু নির্ভীক চিত্তে ঐ অন্যায় প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ম্যানেজার সাহেব অতি উচ্চ প্রকৃতির লোক, যাদব বাবুর হৃদয় পরীক্ষার জন্য সেদিন সেইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যাদব বাবু তাহা বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ অতীব দূষণীয় হইয়াছে।

প্রস্তাব ও প্রতিবাদ পরীক্ষার জন্যই হউক বা সত্য সত্য স্বার্থের জন্যই হউক—ইহার পরিণাম বড় সুখের হইল না।

ম্যানেজার সাহেব যাদব বাবুর বিরোধী হইলেন, অন্যান্য কর্ম্ম-চারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে সমুদ্যত হইলেন। ম্যানেজার সাহেব অবকাশ পাইলেই এজেণ্টের নিকট যাদব বাবুর বিরুদ্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে যাদব বাবু একদিন বলিয়াছিলেন—"ম্যানেজার সাহেব, আপনি আমার কথা শুনুন, বাজে কথায় কাণ দিবেন না ; আর আমার উপর যদি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, সরল মনে বলুন—আমি কর্ম্ম-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি আমার কথা শুনুন, এ ভাবে কার্য্য করিবেন না।" ম্যানেজার সাহেব সেদিন যাদব বাবুর কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইলেন, এবং ভবিষ্যতে আর এরূপ করিবেন না, স্থির করিলেন।

চক্রান্ত বলিয়া যে একটী কথা আছে, ইহার অর্থ ও ক্ষমতা এত অধিক যে, লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। যে একবার এই পথে পদার্পণ করিয়াছে, কে তাহার গতিরোধ করিতে পারে ? কয়েক দিন গত হইতে না হইতেই ম্যানেজার সাহেব আবার যাদব বাবুর বিরুদ্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং ইহার পরিণামে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। এই ঘটনায় যাদব বাবুর নির্ভীকতা ও সত্যনিষ্ঠা সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাদব বাবু কোন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিতেন না ; তবে

যদি কেহ স্বেচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে বুঝাইয়া দেখিতেন, এবং সে যদি উন্নতির কর্ম্মে যাইতেছে— দেখিতেন, তাহা হইলে কোনপ্রকার বাধা দিতেন না। বাহার সেখ যাদব বাবুর বাটীতে ৩৫ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছেন।

সঙ্গীতেও যাদব বাবুর অনুরাগ ছিল। তিনি যখন নায়েবের কর্ম্ম করিতেন, তখন একজন ওস্তাদের নিকট সেতার বাজান শিখিতেন। এই সময়ে একজন সুবিখ্যাত ওস্তাদ যাদব বাবুকে একদিন সন্ধ্যার সময় সেতারের বহুবিধ আলাপ শুনাইয়াছিলেন, যাদব বাবু তাঁহার আলাপে যথোচিত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন ও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নগদ ৫০৲ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লাভপুরে থিয়েটার পার্টি খুলিবার জন্য পিতার নিকট একদা অর্থ প্রার্থনা করেন। পুত্রবৎসল পিতা অর্থ প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ আমার কতকগুলি টাকা জলে পড়িল।"

নির্ম্মল বাবু থিয়েটার পার্টি খুলিয়া প্রথমেই বিল্বমঙ্গলের অভিনয় করেন। যাদব বাবু এই অভিনয় দেখিয়া অতীব প্রীত হইয়াছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন, "আজ বুঝিলাম আমার টাকাগুলি জলে পড়ে নাই; ছেলে আমার ইহাতেও অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।" এই ঘটনার পরে তিনি উপযুক্ত স্থানে যথেষ্ট ব্যয় স্বীকার করিয়া একটী রঙ্গালয়

প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। লাভপুরের থিয়েটার পার্টি তদবধি সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

যাদব বাবু ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিয়া মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করেন, তবে অপরকে সন্তোষের জন্য মাংস খাওয়াইতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। অপরকে পরিতোষ সহকারে খাওয়ান—তাঁহার নিকট পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত।

তিনি শেষ জীবনে দৈনিক একশত আটবার দুর্গানাম লিখিতেন। প্রথমে চিঠিপত্রাদি পড়িতেন ও কাছারির কাজ দেখিতেন। স্নানের পর রীতিমত সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিতেন এবং অবশেষে ঠাকুরবাড়ীর "প্রসাদ" লইয়া বাটীর ভিতরে মধ্যাহ্নভোজন সম্পাদন করিতেন।

একবার তাঁহার বাটীতে কয়েকটা ইলিশ মাছ কলিকাতা হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। বীরভূম জেলায় ইলিশ মাছ দুর্লভ। সেদিন বাটীতে সকাল সকাল পাকও শেষ হইয়াছিল; এবং ঠাকুরবাড়ীতে পূজার বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ীর পাকও সেদিন যথাসময়ে শেষ হয় নাই। যাদব বাবু সেদিন ভ্রমবশতঃই হউক, আর ইচ্ছা করিয়াই হউক, ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ না লইয়া বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজন করিলেন। ইহার পরিণাম একবারও তিনি তখন ভাবিয়া দেখেন নাই।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যাদব বাবুর ভেদ ও বমি আরম্ভ

হইল। চিকিৎসকগণ এসিয়াটিক্ কলেরা বলিয়া স্থির করিলেন ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন। পুত্র পৌত্র প্রভৃতি আত্মীয়-বর্গকে আনাইবার জন্য তারযোগে সংবাদ প্রেরিত হইল। উপযুক্ত চিকিৎসক আনাইবার ব্যবস্থাও হইল। চিকিৎসকগণ রাত্রি ৩টার সময় জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। পুত্র কন্যাগণ পিতার মুখে "শেষ কথা" শুনিবার জন্য শোকাবেগ রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। যাদব বাবু এই সময়ে কিয়ৎক্ষণ তন্দ্রার ঘোরে অচেতন থাকিয়া হাত মুখ নাড়িতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই ভাবিলেন—জীবনান্তের সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে থাকিয়া যাদব বাবু চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, এবং বলিলেন—"আর আমার জীবনের ভয় নাই। স্বপ্নাবস্থায় ঠাকুর আমাকে বলিলেন—প্রসাদ না লইয়া খাওয়ার পরিণাম এই।" তৎক্ষণাৎ ঠাকুরবাড়ী হইতে চরণামৃত আনীত হইল এবং তিনি এই পরমৌষধ পান করিয়া সুস্থ হইলেন। এই ঘটনার পর তিনি প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া আহার করিতেন না।

মধ্যাহ্নভোজনের পর ঠাকুরবাড়ীর বৈঠকখানায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতেন। এই বিশ্রাম কখন কখন নিদ্রায় পরিণত হইত। দিবানিদ্রা ভাল নয়—এই সংস্কার তাঁহার ছিল, তবে তিনি এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বড় একটা বাড়াবাড়ি করিতেন না। বিশ্রামের পর কোন কোন দিন স্বয়ং কর্ম্মস্থলে

উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেন। বিকাল বেলায় ভ্রমণের পর রামায়ণাদি পুস্তক পাঠ ও হরিনাম জপ করিতে করিতে ত্রিযামার প্রথম যাম অতিবাহিত করিতেন। মন ভাল না থাকিলে কিম্বা ক্রোধের সময় প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতেন, সে সময়ে কাহারও সহিত কথা কহিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি কাহাকেও বৃথা আশা দিতেন না। যাঁহাকে যেরূপ আশা দিতেন, তাহা অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকাংশ স্থলেই অধিক দিতেন; কম করিয়া দেওয়া তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হয় নাই। বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত তিনি কখনও কু কথা বলিতেন না।

যাদব বাবু বড় রহস্যপ্রিয় ছিলেন। তিনি কথায় কথায় সকলকে হাসাইতেন, কিন্তু নিজে প্রায়ই হাসিতেন না। একবার তাঁহার একটী কন্যা বলিয়াছিলেন,—"দেখ বাবা, কুড়োর (কনিষ্ঠ পুত্রের ডাক নাম) কয় জোড়া জুতো র'য়েছে দেখ। বাবা, তোমার এত নাই।" যাদব বাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন— "মা, কুড়ো মনে করে যে, সে বড় লোকের ছেলে—গরিবের ছেলে নয়, আমি যে মা গরিবের ছেলে।"

একদিন যাদব বাবু কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে আমোদপুর ষ্টেশনে ছিলেন। সেইদিন সেই সময়ে ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিল এবং কয়েক মিনিট অধিক ট্রেণটী সেদিন আমোদপুর ষ্টেশনে

থাকিল। এই সময়ে একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ট্রেণ হইতে নামিয়া সাধু বাঙ্গালায় বলিলেন, "যাদব বাবু, আমাকে চিনিতে পারেন ? আপনি যে ইহার মধ্যেই বুড়া হইয়াছেন।" ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যাদব বাবু তখন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই ; এবং সেইজন্য তিনি নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাঁহার পরিচয় বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত চিরপরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় আলাপ করিতে লাগিলেন। ট্রেণও ছাড়িল তাঁহাদের আলাপও বন্ধ হইল। এই মহাত্মা ইংলিশ সাহেব, ভাগলপুরের কমিশনার হইয়া সেখানে যাইতেছিলেন। পূর্ব্বে ইনি রাণীগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন এবং সেই সময়ে যাদব বাবুর সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইয়াছিল। মহাত্মা ইংলিশ সাহেব অতি উচ্চ-প্রকৃতির লোক ; ইঁহার গুণের কথা লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব।

সিয়ারশোল রাজবাটীর ছোট হুজুর কুমার ৺দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর যাদব বাবুকে যথোচিত ভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন। উক্ত মালিয়া বাহাদুরের জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত করালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাধারণের চক্রান্তে পড়িয়া সিয়ারশোল রাজবাটীতে দুষ্টলোক বলিয়া বিবেচিত হন এবং পরিশেষে কর্ম্ম হইতে বিতাড়িত হন। সাধারণের বিশ্বাস—

করালী বাবু নির্দ্দোষ; কিন্তু দশ চক্রে পড়িয়া ভগবান্‌কেও মাঝে মাঝে ভূত হইতে হয়।

করালী বাবুর অগ্রজ শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হেতমপুরের মহারাজার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তিনি বিবেচনা করিলেন—যে কোনরূপে হউক সিয়ারশোলে আমাদের নির্দ্দোষত্ব প্রমাণ করিতে হইবে, পরমেশ্বর অবশ্যই ইহার সহায় হইবেন, তিনি কখনও পাপীকে প্রশ্রয় দান করেন না।

হরচন্দ্র বাবু যাদব বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। যাদব বাবু তখন নাকড়াকোন্দায় হরিশ বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেছেন। হরিশ বাবুর মুখে হরচন্দ্রের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, হরচন্দ্রের অনুরোধে মালিয়া বাহাদুরকে যাদব বাবু একখানি পত্র লিখিলেন। সেই পত্রের অবিকল নকল এই—

শ্রীশ্রীদুর্গা
জয়তি

নাকড়াকোন্দা
১৫ই বৈশাখ ১৩০৩ সাল।

বহুমানাস্পদেষু—

পত্রবাহক শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে অনুরোধ করায় অগত্যা হুজুরকে লিখিতে বাধ্য হইলাম পত্রবাহকের কার্য্যের বিষয় তাঁহার বাচনীক সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া যাহাতে এ. ব্যক্তি আপন পদ পুনঃ প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব ইঁহারা সদ্বংশজাত ও বিশ্বাসী লোক তাহা হুজুর অবগত আছেন অধিক বাহুল্য নিবেদন ইতি—

আজ্ঞাধীন
শ্রীযাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(শিরোনাম)

বহুমানাস্পদবর—
শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া ছোট হুজুর
বাহাদুর সমীপেষু—
শিয়ারশোল রাজধানী।

এই পত্র পাঠ করিয়া মালিয়া বাহাদুর করালী বাবুর বিষয় পুনরায় বিবেচনা করিলেন ও অন্য কোন প্রমাণ না লইয়াই তাঁহাকে নির্দ্দোষ স্থির করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার পদে পুনরায় নিযুক্ত করিলেন। করালী বাবু অদ্যাপি সেই পদে কার্য্য করিতেছেন। হরচন্দ্র বাবুর নিবাস ছিনপাই গ্রাম।

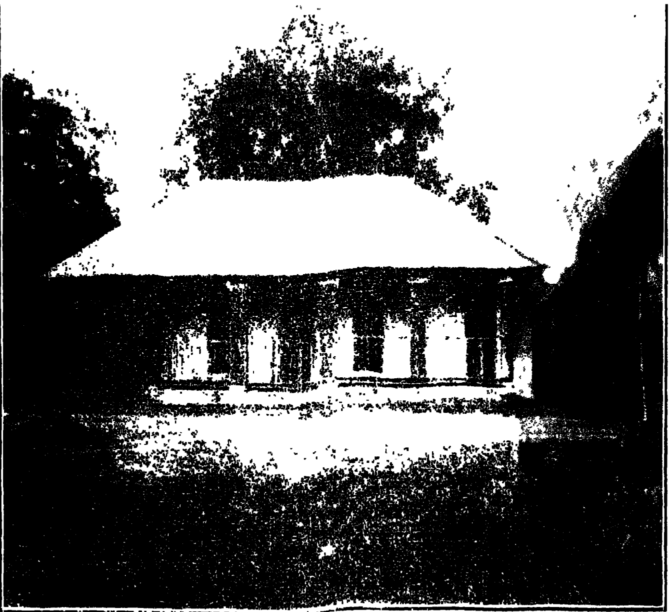
পত্রখানির ভাষা ও ভাব বিবেচনা করিয়া দেখিলে যাদব বাবুর বুদ্ধিমত্তা বুঝিতে পারা যায়। তিনি অতি সুকৌশলে নিঃস্বার্থ ভাব দেখাইয়া অনুরোধ করিয়াছেন। এইরূপ উদাহরণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলেন—যাদব বাবুর কীর্ত্তিকলাপ উপাধি লাভের জন্য। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি—আপনাদের টাকা যথেষ্ট আছে, আপনারা তাহার কিয়দংশ ব্যয় করিয়া সৎকর্ম্ম করেন না কেন? বীরভূম জেলায় কি করণীয় সৎকার্য্য কিছুই নাই? আপনারা হয়ত ইহার প্রত্যুত্তরে বলিবেন, "আমরা উপাধি চাই না।" আমরাও বলিব—উপাধি লাভের আশা না রাখিয়া সৎকার্য্য করিলে হানি কি?

এই পৃথিবীতে যিনি মনে করেন—আমি নিজে সুখে থাকিব, পরমেশ্বরের বিধানে তাঁহার অদৃষ্টে সুখভোগ প্রায়ই ঘটে না। কিন্তু যিনি মনে করেন—আমি যতদূর পারি অপরকে সুখে

রাখিব, পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার সুখ অনন্ত, তাঁহার শান্তি সতত সুবিমল। মানবের আকারে থাকিলেও তিনি আমাদের দেবতা। যাঁহাদের টাকা আছে, তাঁহারা প্রায়ই অপরের মঙ্গলের জন্য টাকা খরচ করেন না; কেবলমাত্র আপনার সুখের চিন্তায় বিভোর থাকিয়া অমূল্য সময়ের সংহার করেন। যদি কেহ অপরের মঙ্গলের জন্য অকাতরে অর্থ দান করেন, আমরা তাঁহাকে "উপাধি লাভের জন্য ব্যয় করিতেছেন" বলিয়া অযথা তাঁহার নিন্দা করি কেন? এইপ্রকার নিন্দায়, যে নিন্দা করে তাহারই হৃদয়ের কঠোরতা প্রকাশিত হয়; এইরূপ নিন্দায় নিন্দাকারীর হৃদয়ের নীচতাই প্রকাশ পায়। যাহার নিন্দা করা হয়, তাহার ক্ষতি কিছুই হয় না, বরং অত্যধিক যশোলাভই ঘটিয়া থাকে। আর এক কথা, যদি কেহ উপাধি লাভের জন্য যাদব বাবুর মত কীর্ত্তিকলাপের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে তাঁহার আশা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের চেষ্টার মত অথবা বামনের চন্দ্র ধরিবার চেষ্টার মত সাধারণের উপহাসের বিষয় হইবে না; তাঁহার চেষ্টা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার তুল্য বীরত্বেরই পরিচয় প্রদান করিবে। যাদব বাবু যদি আর দুই এক বৎসর বাঁচিতেন, তাহা হইলে, আমাদের বিশ্বাস, তিনি সহৃদয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট উপাধিরূপ গুণোচিত পুরস্কার অবশ্যই লাভ করিতেন এবং শত্রুবর্গের কষ্টেরও কারণ হইতেন। আমরা

রাখিব, পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার সুখ অনন্ত, তাঁহার শান্তি সতত সুবিমল। মানবের আকারে থাকিলেও তিনি আমাদের দেবতা। যাঁহাদের টাকা আছে, তাঁহারা প্রায়ই অপরের মঙ্গলের জন্য টাকা খরচ করেন না; কেবলমাত্র আপনার সুখের চিন্তায় বিভোর থাকিয়া অমূল্য সময়ের সংহার করেন। যদি কেহ অপরের মঙ্গলের জন্য অকাতরে অর্থ দান করেন, আমরা তাঁহাকে "উপাধি লাভের জন্য ব্যয় করিতেছেন" বলিয়া অযথা তাঁহার নিন্দা করি কেন? এইপ্রকার নিন্দায়, যে নিন্দা করে তাহারই হৃদয়ের কঠোরতা প্রকাশিত হয়; এইরূপ নিন্দায় নিন্দাকারীর হৃদয়ের নীচতাই প্রকাশ পায়। যাহার নিন্দা করা হয়, তাহার ক্ষতি কিছুই হয় না, বরং অত্যধিক যশোলাভই ঘটিয়া থাকে। আর এক কথা, যদি কেহ উপাধি লাভের জন্য যাদব বাবুর মত কীর্ত্তিকলাপের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে তাঁহার আশা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের চেষ্টার মত অথবা বামনের চন্দ্র ধরিবার চেষ্টার মত সাধারণের উপহাসের বিষয় হইবে না; তাঁহার চেষ্টা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার তুল্য বীরত্বেরই পরিচয় প্রদান করিবে। যাদব বাবু যদি আর দুই এক বৎসর বাঁচিতেন, তাহা হইলে, আমাদের বিশ্বাস, তিনি সহৃদয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট উপাধিরূপ গুণোচিত পুরস্কার অবশ্যই লাভ করিতেন এবং শত্রুবর্গের কষ্টেরও কারণ হইতেন। আমরা



জগদম্বা বালিকা বিদ্যালয়

[৮৭ পৃঃ

বলি, তিনি যদি উপাধি লাভ করিতেন, তাহা হইলে লোকে বলিত—উপাধি লাভের জন্যই যাদব বাবুর কীর্ত্তিকলাপ ; কিন্তু এক্ষণে আর তাহা বলিবার উপায় নাই। তাঁহার অন্তরের আশা যাহাই হউক না কেন—এই সকল কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে না। যিনি যাদব বাবুর কীর্ত্তিকলাপ অবলোকন করিয়া ইহাদের কারণানুসন্ধানে সচেষ্ট হইবেন, তিনি যাদব বাবুর মহানুভবতা ভিন্ন অন্য কোন কারণের সন্ধান পাইবেন না। তিনি কখনই এই সকল কীর্ত্তি-কলাপের মূলে উপাধিলাভের আশা ছিল বলিয়া আপনার খলত্বের পরিচয় দিতে পারিবেন না। এই হেতু আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি—পরমেশ্বর তাঁহার যশোরাশি সুবিমল রাখি-বার জন্যই যেন কোনরূপ উপাধি দানের ব্যবস্থা করেন নাই।

যাদব বাবু পুত্রপৌত্রাদি রাখিয়া, দুহিতা ও দৌহিত্রদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইংরাজী ১৯০৬ সালের ১৭ই এপ্রিল পরলোকে গমন করেন। পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করুন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বংশপরিচয়

ব্রাহ্মণের বংশ পরিচয় দিতে হইলে, আজ কাল বলিতে হয়—কি নাম, কাহার সন্তান, কোন্ মেল, কোন্ গাঁই ও স্বভাব কি ভঙ্গ। পরে প্রশ্নকর্ত্তার আবশ্যক মত পিতার নাম, বাসস্থান, ডাক্‌ঘর ও জেলা প্রভৃতির পরিচয় দিতে হয়। কোন কোন প্রশ্নকর্ত্তা আবার পূর্ব্বনিবাস, মামার বাড়ী, পিতার মামার বাড়ী প্রভৃতিও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আমরা সনাতনী প্রথার পরামর্শানুসারে যাদব বাবুর বংশপরিচয় দিতেছি।

নাম—যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান, ফুলে মেল, বন্দীঘাটী, ভঙ্গ। পিতার নাম—গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গণেশ চন্দ্রের জন্মস্থান সুলতানপুর। ইনি লাভপুরে বাস করেন, সুতরাং যাদবলালের নিবাস—লাভপুর। গণেশচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ হরিনারায়ণ যশোহর জেলার অন্তর্গত প্রতাপকাটীতে বাস করিতেন। তিনি সুলতানপুরে বিবাহ করিয়া বাস করেন। প্রতাপকাটীতে ও সুলতানপুরে যাদব বাবুর জ্ঞাতিগণ এখনও বাস করিতেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমরা এখানে ভট্টনারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া যাদব বাবুর বংশতালিকা দিলাম।

ভট্ট নারায়ণ ১
|
আদি বরাহ ২
|
বৈনতেয় ৩
|
সুবুদ্ধি ৪
|
বিবুধেয় ৫
|
গুঁই ৬
|
গঙ্গাধর ৭
|
সুহাস ৮
|
শকুনি ৯
|
মহেশ্বর ১০
|
মহাদেব ১১

দুর্ব্বলী ১২
|
হরি ১৩
|
উদয় বামন ১৪
|
মাধব ১৫
|
বিষ্ণু মিশ্র ১৬
|
পৃথ্বীধর ১৭
|
গঙ্গাধর ১৮
|
ভগীরথ ১৯
|
শ্রীপতি ২০
|
দুর্গাদাস ২১
|
রাঘব ২২

জয়রাম (যোগাই) ২৩
|
(রাম) কেশব ২৪
|
হরিনারায়ণ ২৫
(প্রতাপকাটী) |
শচীনন্দন ২৬
|
কৃষ্ণকিঙ্কর ২৭
|
রামসুন্দর ২৮
|
দুর্গাদাস ২৯
|
গণেশ ৩০
|
যাদব ৩১
|
অতুল, নির্ম্মল

যাদববাবুর পিতামহ দুর্গাদাস লাভপুরের জমিদার সরকার-দিগের বাটীতে বিবাহ করেন। এই সরকারবংশ গুণে বা গৌরবে হীন নহে।

আজকাল লোকের ধারণা হইয়াছে—যাঁহাদের নামের শেষে "বন্দ্যোপাধ্যায়" "মুখোপাধ্যায়" কি "চট্টোপাধ্যায়" উপাধি নাই, তাঁহারা অব্রাহ্মণ অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। রায়, রায় চৌধুরী, চৌধুরী, সরকার, ঘোষাল, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উপাধিবর্গ অর্থহীন। এইরূপ অযথা ধারণা লোকের মনে কেন বদ্ধমূল হইল, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্র সন্তান "ভট্টাচার্য্য" উপাধির স্থানে বন্দ্যোপাধ্যায় বা চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন। সুতরাং উপাধি পরিবর্ত্তনের একটা যুগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা কে বলিতে পারে? তবে আমাদের বক্তব্য—ভট্টাচার্য্যের পুত্রকে বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতে দেখিয়া আমরা কোন কোন স্থলে হাস্য সংবরণ করিতে পারি না।

আমরা উপনয়ন সংস্কারে বা বিবাহে মন্ত্র পাঠ করিবার সময় "দেবশর্ম্মা" বলিয়া থাকি। কলিকাতা ও তাহার নিকট-বর্ত্তী স্থানে দুই একটী বিবাহসভায় "বন্দ্যোপাধ্যায়" বা "চট্টোপাধ্যায়" বলিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে শুনিয়াছি। তবে কি কালে "দেবশর্ম্মা" উপাধিটীও বিলুপ্ত হইবে?

লুপ্ত হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই; কিন্তু এরূপ বলা অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয়। আমরা ব্রাহ্মণের পরিচয় দিবার সময় গোত্রের নাম বলিয়া নিজ নাম ও শেষে দেবশর্ম্মা বলাই বিহিত বলিয়াই মনে করি। ইহার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। "মুখোপাধ্যায়" বা "বন্দ্যোপাধ্যায়" ভূতপূর্ব্ব বঙ্গাধিপ বল্লাল সেনের চাপরাসী বা পদক। আমরা ইতিহাসে এইরূপ অবগত হই যে, বল্লালসেন আচারাদি গুণের ও বিদ্যার পরীক্ষার পর পদক পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; সেন বংশের ধ্বংসের সহিত পরীক্ষা প্রণালীও পরলোকে পলায়ন করিলেন; কিন্তু পদক পুরস্কারের ব্যবস্থাটী বংশপরিচায়ক কবচের স্থান অধিকার করিয়া ভবিষ্যতের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য বিদ্যমান থাকিল। আজকাল যেমন এম্ এ, বি এ, প্রভৃতি উপাধিগুলি বংশগত নহে, সেইরূপ ঐ উপাধিগুলিও একদিন গুণের পুরস্কার বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং আমাদের মতে ব্রাহ্মণের পরিচয় দিবার সময়, অথবা মন্ত্রাদি পাঠের সময়, শাস্ত্রীয় প্রথার অনুসরণ করিয়া "দেবশর্ম্মা" বলিয়া পরিচয় দেওয়াই উচিত। পরে প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায় মত বন্দ্যোপাধ্যায় কি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পরিচয় প্রদান করিলে ক্ষতি কি?

গণেশচন্দ্রের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্র—যাদব ও প্রিয়লাল। প্রিয়লাল নিঃসন্তান। কন্যা—অন্নদাসুন্দরী ও

কুলদাসুন্দরী। যাদবলালের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্র-গণ—ষষ্ঠীকিঙ্কর, অতুলশিব ও নির্ম্মলশিব। কন্যাগণ—শিব-দাসী, শিবরাণী ও শিবসতী। যাদব বাবুর এই ছয়টী সন্তান ব্যতীত আরও দুইটী হইয়াছিল, তবে তাঁহারা শৈশবেই পর-লোকে গমন করিয়াছে।

জ্যেষ্ঠপুত্র ষষ্ঠীবাবু পিতার মত ব্যবসায়বুদ্ধি লাভ করিয়া-ছেন। তিনি এক্ষণে যাবতীয় কাজকর্ম্ম দেখিতেছেন। মধ্যম—অতুলশিব পুত্রগণের মধ্যে গুণগ্রাহী ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি অকালে পরলোকে গমন করিয়া অমাদিগকে দুঃখিত করিয়াছেন।

অতুল বাবু বাটীর কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার আদেশ মত যাব-তীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইত। তিনি স্থানীয় প্রেসিডেণ্ট্ পঞ্চা-য়ৎ ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। অতুল বাবুর অপক্ষপাত-বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়া সদাশয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট্ তাঁহাকে সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র দিয়া গুণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। তিনি লাভপুর যাদবলাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যা-লয়ের সম্পাদক ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ছাত্র-গণ অতুল বাবুর নাম স্মরণপথে রাখিবার জন্য "অতুলশিব" লাইব্রেরী সংস্থাপন করিয়াছেন।

কনিষ্ঠ নির্ম্মলশিবকে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী বলিলে অত্যুক্তি



৺অতুলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩ পৃঃ

হয় না। ইনি অশ্বারোহণে যেরূপ পটু, অশ্বের গুণাগুণ নির্ণয়েও সেইরূপ নিপুণ। আমরা ইঁহার গান ও বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকিলেও ইনি কৃতবিদ্য বলিয়া বিবেচিত।

নির্ম্মল বাবু সুলেখক। কয়েকখানি নাটক ও নভেল লিখিয়া সাহিত্য জগতে যশস্বী হইয়াছেন। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে ইনি সুলেখকগণের তালিকায় যথাযোগ্য স্থান লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইবেন।

বীরভূম জেলা বঙ্গীয় সাহিত্যের জন্মভূমি। বঙ্গভাষার আদি কবি চণ্ডীদাস লাভপুরের অনতিদূরবর্ত্তী নান্নুরগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া বীরভূমকে দশের নিকট ও দেশের নিকট তীর্থ-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন। বঙ্গভাষার জননী সংস্কৃত সাহিত্য। সেই সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জয়দেব বীরভূমের যে জয়ঘোষণা করিয়াছিলেন, এখনও তাহার প্রতিধ্বনি বিদ্যমান। আমাদের দুঃখের বিষয় এই যে, বীরভূম জেলায় কেহ এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্যের নাট্যশাখায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া বীরভূমের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমাদের এই কথা বলিয়া আর দুঃখ করিতে হইবে না। উদীয়মান নাট্যকার নির্ম্মল বাবুর কৃপায় যাবতীয় বীরভূমবাসী আজ গৌরবান্বিত। আশা করি সকলেই নির্ম্মল বাবুকে শুভাশীর্ব্বাদ করিবেন।

নির্ম্মল বাবুর লিখিত নাটকের একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণ এবং বিষয় বীরভূমের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। "বীররাজা" "বাহাদুর" "রাতকাণা" প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক লিখিয়াছেন। কলিকাতার প্রধান প্রধান রঙ্গালয়ে ঐ সকল নাটক এখনও অভিনীত হইতেছে। নাটকের ভাব ও ভাষা পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ; এ বিষয়ে আমাদের এখানে কিছু না বলাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

নির্ম্মল বাবু এক্ষণে অগ্রজ অতুল বাবুর কার্য্য করিতেছেন। তিনি যে ভাবে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে আমাদের বোধ হয় লোকে অতুল বাবুর গুণাবলী স্মরণ করিবার সুযোগ বুঝি আর পাইবে না ; লোকে সমস্বরে বলিবে, অতুল বাবু আমাদের যেমন পরম হিতৈষী ছিলেন, ইনিও সেইরূপ হইয়াছেন।

স্বর্গীয় বাবু যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মপত্রিকা হইতে জাতচক্র লিখিত হইল। যাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের ফলিত শাখা বিচার করিয়া আনন্দানুভব করেন, তাঁহারা ইহা হইতে প্রচুর আনন্দ লাভ করিবেন।

দশাবিচার, অর্থপ্রাপ্তি যোগ, রাজযোগ প্রভৃতি বিচার সহজসাধ্য ; তবে মারণযোগ বিচার তত সহজ নয়। এখানে মৃত্যুযোগের বিচার লিখিত হইল। যাঁহারা কোষ্ঠী বা জন্ম-

পত্রিকা বৃথা বলিয়া বিবেচনা করেন, আশা করি এই অংশ পাঠ করিলে তাঁহাদের ভ্রম বিদূরিত হইবার বিশিষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা ঘটিবে। তবে একটী কথা, এই বিচারের অংশটী নীরস ; জ্যোতিষ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার না থাকিলে, পাঠকগণ কেবল কতকগুলি অঙ্কপাত ব্যতীত কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। আমরা যতদূর সম্ভব সরল করিয়া এই অংশটী লিখিতেছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

জন্মপত্রিকা ও তাহার বিচার।

শুভমস্তু শকাব্দা ১৭৬৩।১০।১২।১৯।২৮।১২

৪	৮	৫
৩	১১	৩৯
২১	২৬	২৯
:৩	৪	১৩

জাতাহ

০ লং	০	ম ২৬ শু ২৪ বু২৫, র২৪
চ ৯ কে ৮		রা ২১
০ ০	০	বৃ ২০ শ ২০ ০

৫	৯	৬
৪	৭	৩১
১৫	১৮	৩৯
১৮	৬	১৪

পরাহ্ন

জন্ম—ইংরাজী তারিখ ১৮৪২।২৬শে ফেব্রুয়ারী
মৃত্যু—ইংরাজী তারিখ—১৯০৬।১৭ই এপ্রিল।

মৃত্যুকালে বয়স—৬৪ বৎসর ১ মাস ২২ দিন। আয়ুর্গণনা—সূর্য্যোদয় হইতে ইষ্ট দণ্ডাদি ১৯।২৮।১২, জন্মনক্ষত্র ৯, ভুক্ত দণ্ডাদি ৮।২, ভোগ্য দণ্ডাদি ৪৭।৫০, নক্ষত্রমান দণ্ডাদি ৫৫।৫২; সুতরাং আয়ুঃ স্ফুট সাধন মতে ৬৪ বৎসর ৮ মাস ২ দিন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাঁহার আয়ুঃ বা জীবনকাল ৬৪ বৎসর ১ মাস ২২ দিন। কয়েকদিন কম হইবার কারণ নিধনকালে পাপগ্রহের প্রাবল্য। নিধনস্থ রাহুর দশায় মৃত্যুযোগ অবশ্য-ম্ভাবী। বৃহস্পতির দশাশেষের কাল—

৫৭।২।১৫।৫১।৪০

পরে রাহুর দশা ১২।০।০

৬৯।২।১৫।৫১।৪০

যদি পাপগ্রহের প্রাবল্য না থাকিত এবং তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যদি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জন্মিতেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ আয়ুঃ ৬৯।২।১৫।৫১।৪০ হইত। এক্ষণে পাপগ্রহের প্রাবল্য দেখুন।

রাহুর দশায় কুজের অন্তর্দ্দশা ০।১০।২০, এই সময়ের পরে অর্থাৎ ৬৪।১।৫।৫১।৪০ পরে রা ম শ ০।০।২৯।৩০ পরিমিত সময় অতীব মন্দ ফল দিতেছেন। সুতরাং ৬৪।৫।২৯।৩৩।৪০ মধ্যে মরণ সুনিশ্চয়। এই ০।০।২৯।৩৮।০ কাল মধ্যে খণ্ড কাল ১৭।২।০, সুতরাং মৃত্যুকাল ৬৪।১।২১ দিন মধ্যে।

সমাপ্ত।